মহালয়া ১৩৬৪

মুদ্রক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দলপতি
শ্রী সারদা প্রেস
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন,
কলিকাতা ৬

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
কবি ও কবিতা প্রকাশন
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

শান্তিনিকেতন

সূচীপত্র

বাক্‌চিত্র ও বাক্‌ছন্দ

১

রূপলোকের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ বাণীলোকে নিয়ে এলেন এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ। এখানে প্রতিটি টুকরো-কথা রঙের আগুনে জ্ব'লে ওঠে, পংক্তিতে পংক্তিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে রেখা, চমক দিয়ে ওঠে ছবি,—পাতায় পাতায় খুলে যায় রঙবেরঙের চিত্রশালা। অথচ এক হিসেবে তাঁর প্রতিটি ছবিই জীবন থেকে নেওয়া, যদিও তাঁর রূপকথাগুলি জীবনের বাধা নিয়মকে সব সময় মেনে চলে না: যেমন স্বপ্ন, যেমন কল্পনা; এরা জীবনের বস্তুভারহীন সত্য।

তাঁর রূপকথার জগৎটি সত্যই বিস্ময়কর। এখানে প্রাণের একটি তাজা টাটকা ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ যেন শরতের সুন্দর সকাল—শিশিরে-আলোয় চারদিক ঝলমল করছে, উপরের আকাশ স্বচ্ছ নীল, কোথাও কুয়াশার লেশটুকু নেই। এখানকার মানুষগুলি আমাদের চোখের উপর পরিচিতের মতো ঘুরে বেড়ায়; হাসে, খেলা করে, নাচে, গান গায়, বাঁশি বাজায়; আবার হঠাৎ কখন এদের বুকে এসে লাগে কান্নার ঢেউ—চোখ ওঠে ছলছল ক'রে। এখানকার পশুপাখিগুলিও এখানকার গাছপালার মতো সজীব, সতেজ। এখানকার পুতুলগুলিরও যেন প্রাণ আছে, তাদের বুকে দুলছে ছোটো ছোটো সুখদুঃখের ধুকধুকি। এ এক জাদুর রাজত্ব, ইন্দ্রজালের দেশ, এখানকার সব-কিছুই শিল্পীর খেয়ালি মনের সৃষ্টি; টুকরো-কথার রঙ-চড়ানো টুকরো-দেখার 'কুটুম-কাটাম'; এদের বুকেই তিনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন তাঁর মন্ত্র-পড়া জীয়ন-কাঠি।

বিশ্বসাহিত্যের বিশাল জগৎ থেকে হঠাৎ এদিকে চোখ ফেরালে এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা অবনীন্দ্রনাথ আসলে রূপলোকেরই সাধক, বাণীলোকে এসেও তিনি মুখ্যত চিত্রশিল্পী। এই প্রসঙ্গে একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত মনে আসে: রবীন্দ্রনাথের তুলির মুখে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে আশ্চর্যরকমের ছবি বেরিয়ে এসেছিল; শেষ জীবনে হঠাৎ ছবি আঁকতে শুরু ক'রে আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু তবু আমরা তাঁকে প্রধানত কবি বলেই জানি; তিনি নিজেও বলেছেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। এর ঠিক উল্টোরকমটি ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথের বেলা।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হয়েও বাণীর আবেগকে মুক্তি দিয়েছিলেন রেখায়, আর অবনীন্দ্রনাথ মূলত চিত্রশিল্পী হয়েও রূপসৃষ্টির আবেগকে ভাষা দিয়েছেন লেখায়। বাণীলোকে এসেও তাই ছবির জাদুকর হয়েই দেখা দিলেন তিনি।

কিন্তু তা হলেও একথা সত্য যে তাঁর রচনায় তাঁর স্বকীয় বাণীভঙ্গি একটি সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। তাঁর কণ্ঠে সব সময় একটি সাধা গলার আমেজ পাই আমরা, অথচ আশ্চর্য এই যে এর জন্য কোনোদিন আলাদা ক'রে গলা সাধতে হয়নি তাঁকে। অবশ্যি এখানে আমরা বলছি তাঁর চিত্ররূপময় অতুলনীয় গদ্য রচনার কথা,—তাঁর প্রথম জীবনের ছিটেফোঁটা গতানুগতিক পদ্যরচনার সঙ্গে যার কোনোই যোগ নেই। কী ক'রে তাঁর এ সহজ সিদ্ধি সম্ভব হল সে এক রহস্য, তবে এটুকু বুঝতে পারি যে তাঁর মুখের ভাষাটি আসলে তাঁর ভিতরকার রূপসাধকের ভাষা, তাঁর কথা অনেকটা 'রঙরেখার'ই 'রূপকথা'। সাহিত্য রচনার শুরু থেকে তাই হয় তো রূপকথা-রীতিটিই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কথায় কথায় তারার মতো, ফুলের মতো ছবি ফোটানো যে-ভাষায় সবচেয়ে বেশি সম্ভব সে হল রূপকথার ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মতো সচেতন বাণীশিল্পী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। তবু তাঁর প্রথম লেখাটিই ভাষার শিল্পরচনা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'লিখে অভ্যাস করা' বলতে যা বোঝায় গদ্যরচনার ক্ষেত্রে তা এর আগে কোনোদিনই তাঁর হয়ে ওঠেনি। তাঁর কথা থেকেই জানি, লেখার জন্য তাঁকে প্রথম উৎসাহিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর সেই প্রথম উৎসাহের মুখেই তিনি লিখে বসলেন 'শকুন্তলা'র মতো একটি আশ্চর্য সুন্দর বই,—যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি নিখুঁত। শুনতে যতই বিস্ময়কর হোক যথার্থত এই হচ্ছে তাঁর সাহিত্যে হাতে খড়ির ইতিহাস। তিনি নিজের মুখেই বলছেন :

> একদিন আমায় উনি [রবীন্দ্রনাথ] বললেন, 'তুমি লেখো-না, যেমন ক'রে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি ক'রেই লেখো।' আমি ভাবলুম···সে আমার দ্বারা কস্মিন্‌কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই-না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস ক'রে ব'সে গেলুম লিখতে। লিখলুম একঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা,

ভালো ক'রেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড়ো ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি।

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১২২-'২৩

এই তো সাহিত্যজগতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব! প্রকৃতপক্ষে 'শকুন্তলা'ই হচ্ছে রূপদক্ষের প্রথম বাণীসৃষ্টি,—'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা'। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; অবনীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের স্বরূপলক্ষণটি এতে আগে থেকেই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। আমরা জানি, প্রিয়জনকে শুধু একটুখানি মৌখিক উৎসাহ দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেন নি, তা হলে 'তুমি লেখো-না' পর্যন্তই বলতেন; কিন্তু সেই সঙ্গে 'তুমি যেমন ক'রে মুখে গল্প কর' বলার অর্থই হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের 'মুখে গল্প করা'র বিশিষ্ট ধরনটির মধ্যে একটি শিল্পসম্মত মৌলিক বাণীভঙ্গি ফুটে উঠেছে, এবং তাকে ঠিক সেইভাবেই সাহিত্যে পরিবেশন করতে পারলে বাণীশিল্পের জগতেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, সমস্ত বইটিতে তিনি একটিমাত্র কথা লিখেছিলেন 'সংস্কৃতে' অর্থাৎ তথাকথিত বিশুদ্ধ ভাষায়। তার মানে, এ ছাড়া অন্য সব জায়গায় তিনি আটপৌরে মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে অভয় পেয়ে প্রথমে বাধামুক্ত হয়েছে তাঁর মন, তারপর পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন নিজের স্বভাবের প্রেরণায়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যেই তাঁর আত্মবিশ্বাস এল অমনি হুহু ক'রে ছুটে চলল তাঁর কলম, লিখে চললেন বইয়ের পর বই।

২

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই বাণীশিল্পে তাঁর এতখানি সিদ্ধিলাভ কী ক'রে সম্ভব হল? এর একটি প্রধান উত্তর এই যে, আসলে তাঁর

অজান্তেই তাঁর মধ্যে গোড়া থেকে এর জন্য একটি প্রস্তুতি চলছিল। তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় এবং অসাধারণ শ্রুতি ও স্মৃতি-শক্তির গুণে ভাষার একটি বিশেষ শিল্পভঙ্গি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। ছেলেবেলাকার রূপকথা-শোনা কান তাঁর পরিণত বয়সেও কতখানি সূক্ষ্ম ও সজাগ ছিল, তাঁর শেষ লেখাগুলিতে পর্যন্ত তার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকথারও একটা স্থায়ী শিল্পরূপ আছে, সেটা লোকসংস্কার থেকে পাওয়া। অবনীন্দ্রনাথের বালক মন এর সহজ প্রাণছন্দটি স্বভাবতই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু কেবল এতেই প্রশ্নটির সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। রূপকথার লোকসংস্কারজাত শিল্পরূপটিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও অবনীন্দ্রনাথের রচনা যে শিল্পের প্রাকৃতস্তরের অশিক্ষিতপটুত্ব নয় তা আমরা তাঁর যে-কোনো একটি পংক্তির একটি ভগ্নাংশ থেকেই বুঝতে পারি। তাঁর ভাষার ঐ আটপৌরে ঢঙের মধ্যেই আমরা এমন একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পসঙ্গতির পরিচয় পাই, যা মহৎ বাণীসাধকেরও সাধনা-সাপেক্ষ।

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা বাণীর সিদ্ধরসমূর্তি একেবারে প্রথমেই কারো কাছে আবির্ভূত হয় না, রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ কবির কাছেও নয়,—তাঁকেও এর জন্য দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি তাঁর 'মানসী'র আগেকার যাবতীয় কবিতার শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বলেছেন, 'লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি'। তাঁর আদর্শ অনুসারে 'মানসী'র কাল থেকেই তাঁর লেখা 'প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে'। আবার রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে 'মানসী' গ্রন্থের 'সূচনা'য় সব শেষে বলেছেন 'মানসী'তেই সর্বপ্রথম 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'। অথচ 'মানসী'র রচনাকাল ১৮৮৭-১৮৯০। এখন, 'কবি'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বাণীশিল্পীরও যদি এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হলে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একেবারে প্রথমেই 'লেখকে'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন কী ক'রে ঘটতে পারল? রূপকথার ভাষার প্রাকৃত শিল্পভঙ্গিটি তাঁকে প্রথম থেকেই সাহায্য করলেও, সেই সঙ্গে বাণীর যে-সূক্ষ্মতর শিল্পসৌন্দর্য যুক্ত হলে রূপকথার ভাষা পরিস্রুত হয়ে শকুন্তলার ভাষার পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তার জন্য তিনি ভাষাকে নিয়ে এর আগে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। নির্বাচনের নৈপুণ্য, বিন্যাসের সংগতি ও প্রকাশের যাথার্থ্য—শিল্পরূপায়ণের এই তিনটি প্রধান গুণ তিনি এর আগে কীভাবে আয়ত্ত

করেছিলেন? সর্বোপরি, সার্থক সৃষ্টিক্রিয়ার পদে পদে যে-একটি সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পসংযমের প্রয়োজন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাধনার মধ্য দিয়েই তো তাকে বহু চেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসে: 'শকুন্তলা'র রচনাকাল ১৮৯৫ সাল। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে যে-সাধনা করে এসেছেন তা একান্তভাবে চিত্রশিল্পের। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্র-সংখ্যায়[১] অবনীন্দ্রনাথের এই সময়কার শিল্পসাধনা সম্বন্ধে যে তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তার থেকে জানতে পাই, ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫—এই সময়টি হচ্ছে তাঁর চিত্রসাধনার প্রথম পর্ব। এ-পর্বে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির কলা-কৌশলগুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৯০-১৮৯৩ হল এর প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৯৩-১৮৯৫। প্রথম পর্যায়ে Gilhardi-র কাছে ছয় মাস চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পর খসড়া ও নকশাচিত্র (sketch) আঁকবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছয় মাসের জন্য মুঙ্গেরে যান। সাধনার এই পর্যায়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র সচিত্র সংস্করণে অনেকগুলি রেখাচিত্র আঁকেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র চিত্রসংখ্যা ৩২। তা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' ও 'বধূ' কবিতার জন্যও কয়েকটি ছবি আঁকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক Palmer-এর কাছে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অঙ্কনপদ্ধতি চূড়ান্তভাবে শেখেন। এ সময়ে তিনি অনেকগুলি কালি-কলমের ছবি (pen and ink), জল-রঙের ছবি (water colour), প্যাস্টেল-প্রতিকৃতি (pastel portrait) ও কয়েকখানি তৈলচিত্র (oil painting) এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, এবং দ্বারকানাথের তৈল-প্রতিকৃতির একটি অবিকল অনুলেখন (oil copy) তিনি এই পর্যায়েই এঁকেছিলেন; আর এঁকেছিলেন রবি বর্মার ধরনের কয়েকখানি ছবি: মায়ামৃগ, শকুন্তলা ও সন্ধ্যা। তাঁর এই সময়কার ছবিতে ছায়াসুষমা (light and shade), বর্ণবিন্যাস (colour) ও স্পৃশ্যগুণ বা বুনন (texture)-এর উৎকর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইভাবেই তিনি সাধনার প্রথম পর্বে চিত্ররূপায়ণের প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৯৫ থেকে. তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বিখ্যাত ধারাবাহিক 'চিকন-কাজে'র ছবিগুলিকে অবলম্বন ক'রে, আর ঠিক এই বছরেই লেখা হয় তাঁর প্রথম বই 'শকুন্তলা', যা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লাভ করে বাণীর পূর্ণ সিদ্ধি। চিত্রের জন্য এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনের পর অর্জিত সিদ্ধির কাছে এই সহজলব্ধ বাণীসিদ্ধি যেন সত্যিই

বিস্ময়কর ঠেকে। তবে যদি স্বীকার করা যায় যে রূপশিল্পের অনুশীলন করতে গিয়ে ভাবরূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি যে সৃষ্টিসাধনা করেছিলেন তাই তাঁকে এমন একটি গভীর শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা এনে দিয়েছিল যা বাণীশিল্পের সৃষ্টিতেও প্রথম থেকেই তাঁকে সাহায্য ক'রে এসেছে, তা হলে একরকম ক'রে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে পারি যে রূপশিল্পের সাধনার মধ্যে দিয়েই হয়তো তাঁর প্রাকৃতসত্তা ধীরে ধীরে শিল্পীর সিদ্ধসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তাঁর সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিই শিল্পের রসদৃষ্টি হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মুখের আটপৌরে কথাগুলিও এই দৃষ্টির আভায় উজ্জ্বল ও চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছিল।

অবশ্যি এক শিল্পের সাধনার দ্বারা অন্য শিল্পে সিদ্ধিলাভ—এমনটি সচরাচর ঘটে না, তবে ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের শিল্পিকবিদের (**Painter-Poet**) কথা প্রথমেই মনে আসে। চীনের বিখ্যাত শিল্পিকবি ওআঙ-উই (**Wang-Wei**) ও সু-তুং-পো'র (**Su-Tung-p'o**) কথা অনেকেই জানেন। বস্তুত সুঙ (**Sung**) যুগের শেষভাগ থেকে মিঙ (**Ming**) যুগ পর্যন্ত, এবং বিশেষ ক'রে চিঙ (**Ching**) যুগে—চীনদেশে বহু শিল্পিকবির আবির্ভাব হয়েছে। জাপানের শিল্পিকবিদের মধ্যে কোবো-দাইশি (**Kōbō-daishi**) কাজান ওআতানাবে (**Kazan Watanabe**) প্রমুখ কয়েকজন তো বিশেষভাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। য়ুরোপে স্বয়ং মাইকেল এঞ্জেলোও কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। অন্যদিকে ব্লেক এবং প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তদের মধ্যে রসেটির **'The Blessed Damozel'** একই সঙ্গে শিল্পিকবির ছবি ও কবিতায়—রূপলোক ও বাণীলোকে—যুগ্মমঞ্জরীর মতো ফুটে উঠেছে।

কিন্তু দূর দেশে, দূর কালে গিয়ে লাভ কী? আরেক দিক দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষ জীবনে তাঁর তুলির মুখে যেদিন হঠাৎ ছবির ঝড় উঠল সেদিন আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। এই বিচিত্র 'আকার-ফোয়ারা'র উৎসমুখটি কোথায় লুকিয়ে ছিল এতকাল? কবে তিনি শিখলেন এমন করে তুলি ধরতে? তাঁর ছবি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শিল্পী যামিনী রায় চিত্র আর বাণীশিল্পের মধ্যেকার একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের কথা বলেছেন। কথাটি অন্যদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যামিনী রায় লিখেছেন :

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে···ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুকমাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়বার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই ; অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনামাত্র।

—রবীন্দ্রনাথের ছবি : কবিতা : আষাঢ় ১৩৪৮ : পৃ ৪১

এর থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে : 'কল্পনার' 'ছন্দোময় শক্তি' এমন একটি নিয়ন্ত্রিত বেগ যা চিত্র ও বাণীশিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সব সময় কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং সে-শক্তি 'অসামান্য' হলে এক শিল্পের সাধক অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে 'নব আগন্তুকমাত্র' হয়েও সেখানে নিজের অধিকার প্রসারিত করতে পারেন, এমন-কি সে-শিল্পের উপায়-উপকরণগুলিও 'সবই তিনি আয়ত্ত' করতে পারেন,— এবং সেখানে 'অনভিজ্ঞতার' লেশতম 'ত্রুটি'ও না-ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে লেখার ছন্দই যে রেখার ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে স্টেলা ক্রামরিশ-ও তা স্বীকার করেছেন :

The beautiful graphs are those of a poet whose vision is in the words ; their strength is also in the lines.[২]

এখন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি—'**whose vision is in the words** - যে শক্তির বলে চিত্রশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের মতো রূপদক্ষও অন্যদিক থেকে তার অনুরূপ শক্তির বলে বাণীশিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। এর একটা শিল্পভিত্তিক ব্যাখ্যাও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পমাত্রেরই মূলে যে-শক্তি মুখ্যত ক্রিয়া করছে তা চিত্তের রূপায়ণীবৃত্তি। উপাদান যতই বিভিন্ন হোক, যেখানেই সত্যিকার শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সেখানেই শিল্পীর চিত্তগত ভাবকল্পনা একটি রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেছে। উপাদানগত বস্তুপদার্থে আশ্রিত এমন-কি লগ্ন থেকেও বস্তুর স্থূলতাকে সে বহুদূরে ছাড়িয়ে যায়, এবং শিল্পীর চিৎ বা সম্বিতের তড়িৎস্পর্শে তার প্রাণধর্মী ঐক্যের মধ্যে দিয়ে একটি চৈতন্যময় প্রকাশ দ্যোতিত হয়। এই চেতনার দ্যুতি, এই '**transcendental glittering of the intelligible form**' সকল শিল্পেরই প্রকাশব্যঞ্জনার শেষ কথা। যামিনী রায়ের

ভাষায় 'কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে'ই হোক, আর Bell-এর ভাষায় **'vision of significant form'**-এর জন্যই হোক, যে-কোনো উপাদানকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টির মধ্যে এই শিল্প-আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে সকল শিল্পের এই মূল কথাটি বার বার বলেছেন। শিল্পের আলোচনায় 'সুর সার রূপ কথা' এই শব্দ কয়টি তিনি প্রায় সব সময়ই একসঙ্গে বলতেন।

৩

এক হিসেবে রূপশিল্প আর বাণীশিল্পের মধ্যে একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। বাণীশিল্পের চরম উৎকর্ষ কবিতা। ছবির সঙ্গে কবিতার রূপায়ণগত কয়েকটি বিষয়ে পরোক্ষ মিল লক্ষ্য করা যায়। চিত্রশিল্পের ষড়ঙ্গবিচারে বলা হয়েছে :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

ছবির মতো কবিতারও যে শিল্প হিসেবে ছয়টি অনুরূপ অঙ্গ আছে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ছবির ষড়ঙ্গের শুরুতেই যে 'রূপভেদে'র কথা বলা হয়েছে সেটা সকল শিল্পের তো বটেই, সমস্ত জগৎ-বৈচিত্র্যেরই গোড়ার কথা। সৃষ্টি-উৎসের মুখেই এই রূপভেদের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথ এর কথা আগেই অন্যত্র বলেছেন, ও পরে লিখছেন :

> ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা, তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী।...বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য। এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।...তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গম্, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (**suggestiveness**)।... কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, অনির্দিষ্ট

ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা স্পষ্ট হয়।

ছবির অঙ্গ : পরিচয় : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড : পৃ ৫১৯-২০

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কবি তাঁর বাণীসৃষ্টিতে চিত্রশিল্পের রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ—এই ছয়টি অঙ্গকেই স্বতন্ত্র উপায়ে প্রকাশ করে থাকেন, কেননা কাব্যের শিল্পকৌশলের মধ্যেও এরা অন্যভাবে জড়িয়ে আছে। অবশ্যি উপায় স্বতন্ত্র হলেও শব্দের নিপুণ নিবাচন ও বাণীর সার্থক প্রয়োগকৌশলের দ্বারা কবিতার শিল্পদেহেও রূপশিল্পের অঙ্গগুলিকে পরোক্ষভাবে দ্যোতিত করা যায়, যদিও এদের একটিকে বাণীতে প্রতিফলিত করা সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। বাণীশিল্পের পক্ষে শব্দরুচি, অলংকার-সুষমা, এবং বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের ভাবদ্যুতির সাহায্যে চিত্রের রূপভেদ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়তো ততটা শক্ত নয়, যতটা দুঃসাধ্য চিত্রের প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণসংগতিকে বাণীর পরিমাণসংগতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কাছে এরা একেবারে জাত আলাদা—একটিকে দেখি চোখ দিয়ে, অন্যটিকে শুনি কান দিয়ে, কাজেই এদের পরিমাণচেতনা ভিন্নপ্রকৃতির বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া এদের মধ্যে আরো একটি বড়ো তফাত এই যে এদের একটিকে আমরা দেখছি স্থানের 'সহভাবে' (**process of co-existence**), অন্যটিকে শুনছি কালের 'অনুক্রমে' (**process of succession**)। স্থান ও কালের পরিমাণের মান বাহ্যত এক হতে পারে না। এই জন্যই, রেখার ছন্দে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করলেও একমাত্র সেই কারণেই ভাষার ছন্দকে আয়ত্তে আনা যাবে, এ-কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এই দুটি ভিন্নজগতের ছন্দকে একমাত্র তিনিই মেলাতে পারেন যিনি দৃষ্টি ও শ্রুতির, স্থান ও কালের প্রকৃতিগত বাহ্য বৈষম্যকে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিতে গভীরতর সামঞ্জস্যে এক ক'রে নিতে পেরেছেন। তিনি যে-কোনো একটি শিল্পের পথ ধ'রে এগিয়ে গিয়েও এই উভয়বিধ ছন্দের অন্তর্নিহিত সংগতিসুষমাকে আপনার ধ্যানের আলোকে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের ঊর্ধ্বে চেতনার রম্যালোকে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রাণছন্দকে আলিঙ্গন ক'রে বলতে পারেন যে, ঐ একই ছন্দ ছবির জগতে স্থানবিধৃত রূপরেখার স্থিরতরঙ্গে ও বাণীর জগতে কালপ্রবাহিত ধ্বনিকম্পনের অস্থিরতরঙ্গে অনুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে। এবং তিনি এও জানেন যে রেখার ঐ স্থিরতরঙ্গই যে-কোনো

মুহূর্তে চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার বাণীর অস্থিরতরঙ্গও প্রবহমান অবস্থাতেই অন্তরের স্তিমিত ধ্যানলোকে এক প্রশান্ত স্তব্ধতা বিস্তার করে। এই উর্ধ্বতর চৈতন্যলোকের অনুভবেই এই দুই স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় একাত্মতা স্থাপিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের গভীর শিল্পচেতনায় এই অনুভবটি সব সময়ে ক্রিয়া করেছে। তাই ভাষার ছন্দের স্বতন্ত্র রীতিপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি তারই মধ্যে দিয়ে রূপরেখার ছন্দের ধ্বনিময় প্রতিস্পন্দন জাগাতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকে আমরা তাঁর রূপকথা-শোনা কান. ও তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতিচেতনার কথা বলেছি। যাঁরা তাঁর এসরাজ শুনেছেন তাঁরাই জানেন শ্রুতিলোকের অতি উর্ধ্বস্তরেও তাঁর কী স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল। তাঁর সুরভরা মনের স্বাভাবিক সংগীতপ্রিয়তার জন্য রূপকথার ভঙ্গি ও ছড়ার ছন্দের ভাষাগত সংস্কারটি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। পরে রূপদক্ষের গভীরতর শিল্পবোধ ও সূক্ষ্মতর ছন্দোবোধের দ্বারা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে এই লৌকিক শিল্প-সংস্কারটি তাঁর রচনায় এক অনবদ্য বাণীশিল্পের জন্ম দিয়েছে।

৪

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে চিত্ররূপায়ণের দৃষ্টান্ত দিতে হলে তাঁর প্রায় সব লেখাই তুলে দিতে হয়, তাই আপাতত তাঁর একেবারে প্রথম রচনার গোড়ার দিক থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। সাধারণ বাণী-প্রধান কবিতায় অথবা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে রূপশিল্পের ছয়টি অঙ্গের পরোক্ষ আভাস স্বভাবতই কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু থেকেই তারা যেন একেবারে স্পষ্ট ও উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। 'শকুন্তলা' বইয়ের প্রথম পাতাটিই খোলা যাক :

> এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

—একেবারে ছবির ভাষা,—তুলির টানে আঁকা। প্রতি টান অব্যর্থ, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। আর এমন টাটকা ছবি যে মনে হয় এখনো কালি শুকোয় নি।

এবার পাতা উল্টোতেই খুলল ১৪ পৃষ্ঠা :

> অমনি হাতীশালে হাতী সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

একেই বলে চলন্ত ছবি। ভাগ্যিস্ 'সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল', নইলে মনে হত অবাক্ ছায়াচিত্র দেখছি।

একটা পাতা উল্টোতেই চোখ পড়ল ১৭ পৃষ্ঠায় : এবার আর মানুষের ছবি নয়, একপাল জন্তুর ছবি :

> মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘসছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

—এক-একবার মনে হয় বনের এই জন্তুগুলো তুলির ছবিতে কি এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট, বেশি জীবন্ত হত? এরা শুধু জীবন্ত নয়, জ্যান্ত—নড়ছে, উঠছে, ছুটছে, তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে,—প্রতি মুহূর্তে ভঙ্গির বদল হচ্ছে। এদিকে বাঘ 'হাঁকার' দিল বনে, তো সিংহ 'গর্জন ক'রে উঠল' পর্বতে, সঙ্গে সঙ্গে 'বন' 'কেঁপে উঠে' হয়ে গেল 'অরণ্য'।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই : শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া। এ তবু তো 'শকুন্তলা' বই—সবে তাঁর হাতে খড়ি। এর পর যত দিন গেছে ততই তো হাত এসেছে, ছবি আরো উতরেছে, বৈচিত্র্য আরো বহুগুণ বেড়েছে। আমরা যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, তাঁর চিত্রধর্মী লেখাগুলি এতই সার্থক যে মনে হয় শুধু ছবিই দেখছি, কথাগুলি ভালো ক'রে শোনবার আগেই ছবি হয়ে উঠছে। ছবির ছন্দ আর কথার ছন্দ একসঙ্গে মিলে-যাওয়াতেই যেন এই জাদুর খেলাটি, আরো বেশি ক'রে জ'মে উঠেছে। রূপকথার ঢঙ আর ছড়ার ছন্দ—এই দুয়ে

মিলে গোড়াতেই যে মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে, ওস্তাদ শিল্পী পরিণত বয়সে তাকে আরো নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি মেশানো 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে এর দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একেবারে প্রথম পাতাটিই খুলছি :

> আমরা বর্ষাকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝন্‌ঝন্; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম, থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাঁপাই শাড়ি—কি বাহার খুলত!

এ হল দিনের বেলার ছবি। তার পর—

> সন্ধ্যে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল, সে কি জল, কি ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতালা বাড়ি যেন কাঁপছে, পাকা ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে সব শোবার ঘরে। পিদিম জ্বালায় দাসীরা, নিবে নিবে যায় বাতাসের জোরে। বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে দাসীরা আমাদের কোলে করে দোতলায় নাচঘরে এনে শোয়ালে। বাবা মা, পিসি পিসে, চাকর দাসী, ছেলেপুলে সব এক ঘরে। এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্মদাসী কটর কটর কলাই-ভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দুয়েকটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে—ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।

—উনিশ শতকের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখতে দেখতে নেমে আসে রূপকথার রাত, রূপকথার কঙ্কাবতী আর কাঞ্চনমালা-মধুমালারা চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়,—ছড়ার সুর গুন্ গুন্ করছে হাওয়ায়, চোখের পাতায় একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে স্বপ্নের মায়াপুরী। এই পদ্মদাসীর ছড়া-কাটার ছন্দ—এই 'ঘুমতা ঘুমায়' সুর—তন্দ্রার গুঞ্জনের মতো আমাদেরও কানে ভেসে আসছে।

অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল ব'লেই এই রূপকথা-শোনা শিশুর জগৎ, এই ছড়ার-সুরে-গাঁথা বর্ষাসন্ধ্যা তাঁর বালক মনের উপর সম্মোহের এমন একটি মায়াজাল বিস্তার করেছিল যা শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মনকে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তাই তাঁর প্রতিটি কথায় রূপকথার ভঙ্গি এত অনায়াসে এমন অবিকল ফুটে উঠেছে। অথচ এই লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'রেই

তাঁর ভাষা তাঁর অসামান্য শিল্পদৃষ্টির আলোকে এক নূতন আভায় মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ। খাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিত্র ছড়ায় এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার মধ্যে দিয়ে খামখেয়ালি উদ্ভট পুঁথি-পালাগান পর্যন্ত চারিয়ে নিয়েছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে যে কী অলৌকিক খেলা খেলতে পারে তাঁর রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব রচনায় খানিকটা গদ্যের ভাঁজ, খানিকটা ছড়ার,—সব মিলিয়ে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। অনেকগুলি কথাই ছড়ার মতো পর্বে পর্বে ভাগ করা যায়, প্রায় প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে 'দল' (Syllable) থাকে, আর কথার চালও অনেকটা লৌকিক 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের বা 'দলমাত্রিকে'র। উপরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র উদ্ধৃতি থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

১.	তালপাতার	ভেঁপু কিনে	বাজাতুম ;
২.	রথের চাকা	শব্দ দিত	ঝন্‌ঝন্ ;
৩.	আকাশ ভেঙে	বৃষ্টি পড়ত	দেখতে পেতুম,
৪.	পাকা ছাত	ফুটো হয়ে	জল পড়ছে
	স—ব	শোবার ঘরে।	
৫.	বাবা মা,	পিসি পিসে,	চাকর দাসী,
	ছেলেপুলে,	স—ব	এক ঘরে।
৬.	পদ্মদাসী	কটর কটর	কলাই ভাজা
	চিবোচ্ছে,		
৭.	চুপি চুপি	ছড়া কাটছে	ঘুমতা ঘুমায় ;

আর দরকার নেই। এতেই আমাদের বক্তব্য বিশদ হবে। এখানে সবসুদ্ধ ২৭টি পর্বের মধ্যে ১৭টিই চার 'দলে'র পর্ব। বাকি দশটির মধ্যে ২টি পর্বই হচ্ছে 'স—ব্', এদের পুরো পর্বের ওজন দিতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘায়িত করতে হয়, নয় তো 'উনপর্ব' ব'লে ছেড়ে দিতে হয়। বাকি ৮টি পর্ব হল 'তালপাতার' 'বাজাতুম' 'ঝন্ ঝন্' 'পাকা ছাত' 'জল পড়ছে' 'বাবা মা' 'এক ঘরে' আর 'চিবোচ্ছে'। এদের মধ্যে এক 'ঝন্ ঝন্' পর্বটির 'দল'সংখ্যা ২, বাকি প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৩। কিন্তু কান পাতলেই বোঝা যায়, এদের 'দল'সংখ্যায় যতই কমতি থাক, এদের 'মাত্রা'সংখ্যা বা ওজন চার 'দলে'র পর্বগুলির সমান।

স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গি অনুসারেই আমরা এই কথাগুলির একটি-না-একটি স্বরধ্বনিকে একটু টেনে উচ্চারণ করি। আর ছড়ার বেলা তো কথাই নেই, স্বরধ্বনির প্রসারণ-সংকোচনের ব্যাপারে ছড়া অনেকটা নিরঙ্কুশ। তা হলে দেখতে পাচ্ছি, 'সব' কথাটিকে পুরো এক পর্বের ওজন না দিলেও উপরের ২৭টি পর্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ২৫টিকেই আমরা ছড়ার 'দলমাত্রিক' রীতির 'সমমাত্রিক' পর্ব বলতে পারি। অথচ অবনীন্দ্রনাথ তো কথাগুলি আগাগোড়া গদ্যেই বলে গিয়েছেন! গোটা বইটিই তো তাঁর মুখের কথার শ্রুতিলিখন!

এ তো গেল তাঁর আত্মকাহিনী থেকে নেওয়া অংশ, আর যেখানে তিনি খাঁটি রূপকথার আসর জমিয়েছেন সেখানে ছবির আলো আর ছন্দের কাঁপনে মিলে পংক্তিগুলি কেবলি ঝিলিক দিচ্ছে, প্রতিটি ছোটো ছোটো পর্ব তারার কণার মতো ঝিকমিক করছে। বেশি খোঁজাখুঁজি না ক'রে তাঁর প্রথম রূপকথার বই 'ক্ষীরের পুতুল'-ই খুলে দেখা যাক। পাতা উল্টোতেই চোখ পড়ছে ৭৩ পৃষ্ঠায়:

বানর দেখলে—	ষষ্ঠীতলা	ছেলের রাজ্য,
সেখানে	কেবল ছেলে—	ঘরে ছেলে,
বাইরে ছেলে,	জলে স্থলে,	পথে ঘাটে,
গাছের ডালে,	সবুজ ঘাসে	যেদিকে দেখে
সেইদিকেই	ছেলের পাল	মেয়ের দল।

ভাবছি, ষষ্ঠীতলার চারদিকে ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভিড়ের ছবিটি কলমের এক আঁচড়ে যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঙ-রেখায় এর কতটুকু ফুটতে পারত? এখানে কথার ভঙ্গিটি রূপকথার, কিন্তু ছন্দটি আগের মতই 'দলমাত্রিক'। সবসুদ্ধ ১৫টি পর্বের মধ্যে ১০টিতেই 'দল'সংখ্যা চার ক'রে পড়েছে; যে-পাঁচটিতে সংখ্যার গরমিল সেগুলি হচ্ছে 'সেখানে' 'যেদিকে দেখে' 'সেইদিকেই' 'ছেলের পাল' আর 'মেয়ের দল'। প্রথমটি ঊনপর্ব' ধ'রে নিলেই চলে, আর বাক্‌ছন্দ বাঁচিয়ে একটু টেনে পড়লেই শেষের তিনটিকে এক-একটি পুরো পর্বের ওজন স্বচ্ছন্দে দেওয়া যেতে পারে। বাকি থাকে 'যেদিকে দেখে' পর্বটি। এটাকে একটু দ্রুত লয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই, কেননা এখানে পর্বটি যেভাবে এসে বসেছে তাতে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দও তাকে গা মেলে বসতে দিচ্ছে না; তা ছাড়া শুধু এই পর্বটির মধ্যে ছবিরও এমন কিছু ইঙ্গিত নেই যে একে রসিয়ে পড়ার প্রয়োজন

আছে। ছড়ার পর্ব হিসেবে তো একে দ্রুত লয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। 'যেদিকে দেখে' আর 'খুকুমণিকে' এ দুটি কথার প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৫, অথচ :

খুকুমণিকে। বিয়ে দেব। হাটমালার। দেশে

ছড়ায় স্বচ্ছন্দ চলে এবং চমৎকার মানিয়ে যায়।

৫

অবশ্যি অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ছড়ার ছন্দের আধিপত্যের একটা প্রধান কারণ এই যে তিনি মুখ্যত মুখের ভাষার ভঙ্গিটিকেই আশ্রয় করেছেন। আমাদের মুখের ভাষায় অনেক সময়েই এই লৌকিক ছন্দের আভাস আসে। যদি কেউ বলেন, 'সকালবেলা উঠেই দেখি আটটা' কিংবা 'আমার এখন একটি মিনিট সময় নেই'—তা হলে তিনি যে সাদা গদ্যে কথা বলছেন এতে কোনো সন্দেহ থাকে না, কিন্তু কথা দুটির বাক্‌ছন্দই এমন যে তারা আপনা থেকে দলমাত্রিক পর্বে ভাগ হয়ে যায়। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায় ব'লে এই ছন্দটিকে বলতে পারি উভচর ছন্দ - পদ্যের ঢেউয়ে দোল খায়, আবার গদ্যের ডাঙায়ও চ'লে বেড়ায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পলাতকা'র কবিতাগুলির জন্য এই ছন্দটি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, কেননা বইটির লৌকিক কাহিনীগুলিকে খাটি কবিতার আওতায় রেখেই একেবারে লৌকিক ঢঙে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কবিতাগুলির অসমপংক্তির বিন্যাস তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে আরো খানিকটা সাহায্য করেছে।

এই লৌকিক ছন্দের বহুল ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এইটিই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এ-কথা ভুললে চলবে না যে আসলে তিনি রূপশিল্পী। ভাষায় ছবির পর ছবি ফোটাতে গিয়ে ছড়ার ছন্দ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাহায্য পেতে থাকেন ততক্ষণ একে তিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করেন, কিন্তু যখনই ছন্দের অতিরিক্ত দোলায় কথার সংগীতধর্মটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং ছবির রঙরেখা সুরের তলায় চাপা পড়বার সম্ভাবনা ঘটে, তখনই তিনি যথাসময়ে অতি নিপুণভাবে তালের ঢেউ ভেঙে তাকে কথার মধ্যে চারিয়ে দেন। তাতে ঐ ঢেউ-ভাঙার জায়গাটিতে কিছুক্ষণের জন্য ছন্দটি এলোমেলো হয়ে যায় কিংবা হঠাৎ কখনো

অন্য কোনো ছন্দের আভাস ফুটে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক॥ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র অংশ থেকে একটি বাক্য তুলে নিই :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম ;

—এ পর্যন্ত প্রতি পর্বে ৪টি ক'রে 'দল' ঠিকই আছে, কিন্তু তারপর ?—

থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত
চাঁপাই শাড়ি— কি বাহার খুলত !

—এখানে 'থেকে থেকে' আর 'রোদ পরাত' এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের মাঝখানে 'মেঘলা আলোকে' কথাটিতে 'দল'সংখ্যা ৫, অথচ উচ্চারণে অস্বাভাবিক বিকৃতি না-ঘটিয়ে একে সংকুচিত করা অসম্ভব। এতে প্রথম একটি 'দল' ছাড়া বাকি ৪টিই 'মুক্তদল', পর্বের স্বরধ্বনিগুলি যথাক্রমে এ আ আ ও এ-- মাঝখানে দুটি 'আ' (বিবৃত স্বর) একেবারে পাশাপাশি, তা ছাড়া দুই প্রান্তে দুটি 'এ' (অর্ধবিবৃত স্বর) রয়েছে, ৫টি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে ৩টিই অর্ধব্যঞ্জন একটি 'ম' (অনুনাসিক) আর দুটি 'ল' (পার্শ্বিক)—এরা ব্যঞ্জনধ্বনির কোমল-তরল সুর ;—কাজেই ধ্বনিতত্ত্বের দিক বিচার করে দেখলে পর্বটিকে সংকুচিত করবার অসুবিধে আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো বাধা আসছে কথাটির বাণীরূপ আর চিত্রব্যঞ্জনার দিক থেকে। মাঝখানের দুটি 'আ' ধ্বনির 'সন্ধি' করতে পারলে বৈয়াকরণ হয়তো খুশি হন, কিন্তু 'সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা' আমাদের 'মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন।' দ্রুত উচ্চারণের অসংগতি এখানে সইবে কেন ? 'মেঘলা আলোকে'র কোমল আভাটুকু ভাষার তুলিতে ফুটিয়া তোলবার জন্যই তো শিল্পী তাঁর কথার বর্ণধ্বনিগুলিকে এমন নিপুণ কৌশলে আলগোছে সাজিয়েছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্বটিকে তার ছবির ইশারাটুকুর মধ্যে মনে মনে ছড়িয়ে রাখা, আর সমস্ত কথাটির ভাবের মধ্যে আলতোভাবে চারিয়ে দেওয়া। ঠিক এমনি ক'রেই বলব, বাক্যটির শেষাংশের 'কি বাহার খুলত' কথাটিকেও বেঁধে রাখার চেয়ে ছেড়ে রাখাই ভালো। 'রোদ পরাত' 'চাঁপাই শাড়ি'—এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের পরে একটু ফাঁক রেখে তারপর কথাটিকে বসানো হয়েছে,—শিল্পী নিজেই তাকে খানিকটা সরিয়ে এবং ছড়িয়ে রেখেছেন। এখানে 'কি বাহার' কথার শব্দ দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে হয়তো সহজেই ছন্দের বেগ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু বাক্-ভঙ্গির দিক থেকে, এবং বিশেষ ক'রে কথাটির ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকে বিচার করলে এখানে তা না করাই সঙ্গত,

কারণ শব্দ দুটি জুড়ে নিলে কথার আসল বাহারটিই মাটি হবে। এই 'বাহার' শব্দকে আশ্রয় করেই কথাটি এখানে কলাপ বিস্তার করেছে,—চাপাই শাড়ির রূপের শোভা ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়েছে। ময়ূরের পেখমটি মেলে-ধরার জিনিস, তাকে গুটিয়ে নিলে ঝাঁটার মতো পিছনে প'ড়ে থাকে।

তবে, রূপসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্য হলেও, ছন্দের ঢেউ ভেঙে-দেবার ব্যাপারে তাঁর শিল্পিমনে আরো একটি চেতনা কাজ করেছে: অতিরিক্ত নিরূপিতমাত্রার তাল দীর্ঘকাল চলতে থাকলে রচনা পদ্যের চেহারা ধরে, গদ্যের রূপ একেবারেই থাকে না, কাজেই এই কারণেই একটানা ছন্দের মাঝখানে ছেদ আনতে হয়। তখন পাঁচমিশেলি ছন্দের বিচিত্র সমাবেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ হল গদ্যের রীতি বাঁচিয়ে চলার কথা। আবার এবড়োথেবড়ো দৃশ্যের রচনায় কিংবা একসঙ্গে উত্থিত অনেকগুলি ধ্বনিঝংকারের বর্ণনায় ছন্দকে খানিকটা এলোমেলো করে দিতে হয়। শেষোক্তটির একটি ছোটো দৃষ্টান্ত দিই। উপরে উদ্ধৃত বাক্যটির ঠিক আগেই আছে:

রথের চাকা	শব্দ দিত	ঝন্ ঝন্,
যেন	সেতার নূপুর	স — ব
একসঙ্গে	বাজছে।	

এখানে 'যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে'—এই শব্দগুচ্ছের তাল ও বাণীসংগীত কান পেতে শুনলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। উপরের পর্ববিভাগ অনুসারে পড়লেও পর্বগুলির 'দল'সংখ্যার অসমতা কেবলি অসুবিধে ঘটায়: ২, ৪, ১, ৩, ২—এই 'দল'সংখ্যাগুলির পক্ষে এক অনুক্রমে কাঁধ মেলানো সত্যি কঠিন। তা ছাড়া সাধারণ বাক্‌ছন্দে 'যেন' শব্দটাকে টেনে বাড়াবার তো উপায়ই নেই। 'সব' কথাটাকে খানিকদূর পর্যন্ত টানা যায়, কিন্তু তবু একে পুরো এক পর্বের ওজন দিতে পারি নে। অবশ্যি এর স্বরধ্বনিকে সংকুচিত ক'রে 'সেতার নূপুরে'র সঙ্গে জুড়ে দিলে বাক্‌ছন্দের দিক থেকে হয়তো তেমন বেমানান হয় না, কিন্তু ছড়ার 'দলমাত্রিকে'র তাল তাতেও কাটবে। আবার 'একসঙ্গে' কথাটির আগের দিকে একে জুড়তে গেলে প্রমাদ ঘটবে: 'সব একসঙ্গে' দ্রুত উচ্চারণ করলে হয়ে যাবে 'সবেক সঙ্গে', বাক্‌ভঙ্গিতে এই বাণীবিকৃতি অসহ্য। কাজেই এই বাক্যাংশে ছন্দের ঢেউ কিছুটা ভাঙবেই, আর লেখকও এখানে ইচ্ছে ক'রেই তাল কেটেছেন, টিনের রথের চাকার মিশ্রিত ঝন্ ঝন্ শব্দ ভাষায় শোনাতে গিয়েই

তো 'সেতার নূপুর সব' আমদানি হল, ছন্দেও আসুক খানিকটা বিশৃঙ্খলা—তাতেই এখানকার ঠিক তালটি লাগবে, ঠিক সংগতটি জমে উঠবে।

৬

প্রশ্ন হতে পারে, ছবির খাতিরেই হোক আর গদ্যভঙ্গির খাতিরেই হোক, নিরূপিত ছন্দের ঠাটটি মাঝে মাঝে যখন ভাঙতেই হয়, তখন অবনীন্দ্রনাথ ধীর লয়ের প্রচলিত গদ্যরীতিকে আশ্রয় করলেই পারতেন। তুলির ছবিও যখন রঙ-তুলি নিয়ে ব'সে ধীরেসুস্থেই আঁকা যায় তখন আর কথা কী? এর একটি উত্তর হল, গদ্য মূলত চিন্তার ভাষা। গদ্যের অনিরূপিত ছন্দে চিন্তার বিসর্পিল ধারা মন্থর গতিতে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে চলে। এ-রকম অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাদর্শের উপযোগী পরিমাণ-সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় উত্তর হল, রঙ-তুলির ছবি আঁকতে প্রচুর সময় ব্যয় হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের উপর একসঙ্গে ভেসে ওঠে তার সমস্তটা, আমরা তাকে এককালেই দেখতে পাই স্থানের ব্যাপ্তিতে। এখন, কালপ্রবাহিত ভাষাকে একান্তভাবে চিত্ররূপময় ক'রে তুলতে হলে—অর্থাৎ তার প্রতিটি ছোটো ছোটো অংশে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে এক-একটি সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে হলে - তার অন্তর্নিহিত কালের অনুক্রমের মধ্যে স্থানের সহভাবের আভাস আনতে হবে। প্রচলিত প্রবহমান গদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বাণীর বিলম্বিত প্রকাশ ঘটে বলেই তাতে কাল কেবলই দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কাজেই ভাষার এই রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার ভিড়-করে-আসা ছবিগুলি অবিকল সেইভাবে ধরে রাখা অসম্ভব। ছবিগুলি হয় অস্বাভাবিক-রূপে প্রলম্বিত হয়ে পরিমাণ-সঙ্গতি হারাবে, নয়তো গদ্যের দীর্ঘ প্রবহমান ধারার একটানা স্রোতে ধুয়ে-ধুয়ে গ'লে-গ'লে যাবে এবং আকারসীমা হারিয়ে অস্পষ্ট হতে থাকবে। এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অতিনিরূপিত পদ্যছন্দকেও সব সময় হুবহু গ্রহণ করতে চাইলেন না, অন্যদিকে তেমনি গতিমন্থর গদ্যধারার একেবারে অনিরূপিত ছন্দকেও যথাসম্ভব পরিহার করলেন। ফলে আমরা পেলাম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় রচিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক শিল্পময় গদ্যরীতি। এ গদ্য মূলত চিত্রাত্মক, তবে এর ছন্দ মোটামুটি একটি নিয়ন্ত্রিত ঠাটে বাঁধা থাকতে চায় ব'লে, এর রীতিটিকে বলতে পারি

"গীতিচিত্ররীতি'। এর ছন্দ কতকাংশে ছড়ার মতো হলেও এ ছড়া নয়, এর ছাঁদ রূপকথার হলেও এ যত-না 'রূপকথা' তার চেয়ে ঢের বেশি 'রূপের কথা'। এর ছন্দ 'অনিরূপিত'ও নয় আবার 'অতিনিরূপিত'ও নয়, একে বলতে পারি 'অনতিনিরূপিত'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে গদ্যকবিতায় যে ছন্দটি ব্যবহার করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ তার অনুরূপ একটি ছন্দ তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রে যেন আগে থেকেই তাঁর নিজের ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। তা হলেও দুজনের ছন্দের তফাত আছে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রীতিমতো কবিতার কোঠায় এসে পড়েছে, আর অবনীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাষার গীতিচিত্ররীতিকে আশ্রয় ক'রে গদ্যেরই এক নূতন ভঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে লৌকিক 'দলমাত্রিক' ছন্দের বহুল প্রয়োগ ঘটলেও তাকে কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ একটানা ব্যবহার করা হয় নি। ছন্দের ঢেউ কী ক'রে ভেঙে দেওয়া হয় তারও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে কখনো কখনো লৌকিক ঢঙের আওতার মধ্যেই পর্বের 'দল'গুলির বিশেষ এক ধরণের বিন্যাসে, কথার ঝোঁক পালটে দিয়ে নূতন নূতন ছন্দছাঁদের (**pattern**) সৃষ্টি করা হয়েছে :

১. মাথায় তেল দিলে খোঁপায় ফুল দিলে (২।৩, ২।৩),
২. পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে ; (২।৪, ২।৪),
৩. হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, (২।৫, ২।৫);
৪ হীরের বালা কোথায়, মতির মালা কোথায়, (৪।২, ৪।২) ;
৫. কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, (১।৬, ১।৬),

এরকম হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখানে তো শুধু 'শকুন্তলা'র ৩৩ পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদ থেকেই বলতে গেলে প্রায় সবগুলি দৃষ্টান্ত মুঠো ক'রে এনেছি, কেবল শেষ দৃষ্টান্তটি এনেছি ১৮ পৃষ্ঠা থেকে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি নানা ছাঁদের 'অসমদল' পর্বের বিন্যাসে ছন্দকে এবড়োখেবড়ো ক'রে দিয়েও সব মিলিয়ে মোটামুটি একটা পরিমাণ-সংগতি রাখা হচ্ছে। এমনটি ঘটাতে হলে যে নূতন ধরনের ঘটকালি আর জোটক-মিলের প্রয়োজন, গভীরতর ছন্দোবোধ না থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাঁর যে-কোনো বইয়ের যে-কোনো পাতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'বুড়ো আংলা' খুলতেই ৬০ পৃষ্ঠায় চোখ পড়ল :

কানা কুকুরটা	ঘেউ ঘেউ ক'রে	থামলে
হাঁসেরা	হাসতে হাসতে	বললে—
আরে মুখ্যু,	আমরা কি তোর	রাজার কথা,
না রাজবাড়ির কথা,	না মাটির কেল্লার কথা	শুধোচ্ছি ?

প্রথমে মনে হবে ছন্দটা একেবারেই এলোমেলো, কিন্তু খেয়াল ক'রে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারি এখানে গদ্যের অসমতল ভূমিতে শিল্পীর প্রতি পদক্ষেপ সংযত, প্রতিটি বাক্যাংশ শব্দের ধ্বনিসঙ্গতির গভীরতর সূত্রে বিধৃত। কুকুরের ডাক শুনলে কানে একটা ধাক্কা লাগে, কুকুরটা কানা হলে চোখেও ধাক্কা লাগে। তাই এখানে 'কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ ক'রে'—এই বাক্যাংশের বর্ণমালাতে চারটা 'ক' হুঁচট খেয়ে দুটো 'ঘ'-এর ঘাড়ে ধাক্কা মারছে, আর 'টা' শব্দটা মাঝখানে একটা কর্কশ কেঠো আওয়াজ ক'রে উঠেছে। কিন্তু শিল্পীর জাদুতে এর ঠিক পরের কথাটিতেই হাওয়া একেবারে পালটে গেল,—এবার কানা কুকুর নয়, হাঁস। 'হাঁসেরা হাসতে হাসতে'ই তো কথা বলবে, তারা তো হালকা হাসিই হাসে, তারা যে পাখি, তাদের পাখা হাওয়ায় ওড়ে। এখানে 'হাস্'-ধ্বনিটি পর পর তিনবারই শোনা যাচ্ছে, শব্দগুলির মধ্যে যেন হাওয়া শিস দিচ্ছে। এর পর 'হাঁসেরা' যা 'বললে' সে তো কৌতুকের কথাই হবে। কথার ছন্দে-সুরে একটি চাপা-হাসির কৌতুক ফুটে বেরুচ্ছে। বাক্‌ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে এখানে 'থামলে' আর 'বললে' যেন তবলার দুটি অনিবার্য 'ঠেকা', আর সব শেষে প্রশ্নাত্মক 'শুধোচ্ছি ?' কথাটিতে একদিকে যেমন উত্তরের প্রত্যাশাজনিত অসমাপ্তির আভাস আনা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ঘোষবৎ মহাপ্রাণবর্ণ 'ধ'-এর উচ্চকিত আঘাতে তবলার চাঁটি বলছে, 'এই তো সম।'

৭

নানা মাপের নানা ধাঁচের হ্রস্ব-দীর্ঘ পর্ববিন্যাসে কত বিচিত্রভাবেই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে তাল ভেঙে তাল রেখেছেন, আবার তাল রেখে তাল ভেঙেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে-কোনো বই থেকে খানিকটা অংশ পড়লেই পবের অন্তত দশ রকমের নূতন ধরনের বিন্যাস চোখে পড়ে। 'ভূতপত্রীর দেশে'র সূচনাতেই দেখছি :

হুম্পা হুমা	পাল্‌কি চলেছে	বনগাঁ পেরিয়ে ;
ধপড় ধাঁই	পাল্‌কি চলেছে	বনের ধার দিয়ে,
মাসির ঘর ছাড়িয়ে,	ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে	

এখানে 'বন্‌গাঁ পেরিয়ে' 'বনের ধার দিয়ে', 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে', 'ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে',—এই বাক্‌পর্বগুলি লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। শেষের তিনটি তো বাক্‌ভঙ্গির দিক থেকে যথাক্রমে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম। কিন্তু উপায় কী? 'হুম্পা হুমা'র সঙ্গে 'বন্‌গাঁ পেরিয়ে' যেই কাঁধ মেলাল, অম্‌নি 'বনের ধার দিয়ে' কথাটিও সেই সঙ্গে এসে কী ক'রে চমৎকার মিলে গেল। 'বনের ধার দিয়ে'-কে মেনে নিলে 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে'-কেও মানতে হয়, আর তা হলে 'ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে'ই বা বাকি থাকে কেন? একেই বলে অজগর গেলা, অথচ কী সহজে লেখক আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এলেন! আমরা জানতেই পারলাম না কখন 'হুম্পা হুমা'র মতো ছোটো একটি পর্ব থেকে এত দীর্ঘ একটি পর্বে এসে পৌছলাম। শেষের পর্ব তিনটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা একটির পর একটি কেবলি বেড়ে চলেছে, টেনে টেনে কেবলি দীর্ঘ হচ্ছে,—এ ছন্দটাকে বলতে পারি 'টেনে-চলা ছন্দ'। এখানে এরকম ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলে তিনি হয়তো বলতেন, 'তা হতেই তো হবে,—কত বড়ো মাঠ, কত দূরের পথ!' এর উপরে আর কথা নেই।

আবার এর সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছন্দেরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায় তাঁর রচনায়। এর বাক্‌পর্বপরম্পরার ঝোঁকটা ক্রমশ হ্রস্ব হবার দিকে—

একটা করে	খড়খড়ির	ফাঁক[৩]
উত্তর দিকটাতেই	টানছে এখন	মন[৪]
সবুজ রঙ-মাখানো	টানা ঝিলমিল	বন্ধ[৫]
বাঘমুখো গঠনের	কৌচকেদারা	তেপায়া[৬]

কিংবা-

দোতলা থেকে	নামতে পেরে	বাঁচি[৭]
রবিকা বলতেন,	"অবন একটা	পাগলা"[৮]
খোলা হাওয়ায় বসে	পড়তে পাইনি	কখনো[৯]
"ও দিব্যঠাকুর,	আজ কি রান্না?"—	"ভাতে ভাত"[১০]

এরকম বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। এখানে শুধু 'আপন কথা' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র তিন-চারটি পাতা নাড়াচাড়া করতেই দৃষ্টান্তগুলি চোখে পড়ল। এ-ধরনের ছন্দে বাক্‌পর্বের দলসংখ্যা পর-পর কেবলই কমে আসতে থাকে, তাই একে বলতে পারি 'গুটিয়ে-আনা ছন্দ'।

৮

এবার আমরা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের নূতন একটি রীতির উল্লেখ করছি। এতে ছড়ার ছন্দের পৌনঃপুনিকতা কিংবা অসম ছন্দের সংঘাত-সমন্বয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একে বলতে পারি 'দোলনার ছন্দ',—ঝোঁকের এক ঠেলায় একদিকে যতটা এগিয়ে যায়, ফিরতি টানে আরেক দিকে কমবেশি প্রায় ততটাই ফিরে আসে। দোলনায় দোল খাবার সময় সব ঝোঁকের ওজন এক হয় না, কখনো বেশি কখনো কম। ঠেলার বেগ যখন বেশি তখন সামনে-পিছে দুদিকেই দোলনের দূরত্ব যায় বেড়ে, আর বেগ যখন মৃদু তখন দোলনের দূরত্বও আসে ক'মে। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটতে থাকে অবনীন্দ্রনাথের এই ধরনের গদ্যছন্দে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এর স্বরূপলক্ষণটি বোঝা যাবে। ধরা যাক 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে মুখবন্ধের প্রথম কথাটি :

যত সুখের স্মৃতি	তত দুঃখের স্মৃতি
আমার মনের	এই দুই তারে
ঘা দিয়ে দিয়ে	এই সব কথা
আমার শ্রুতিধরী	শ্রীমতী রানীচন্দ
এই লেখায়	ধ'রে নিয়েছেন,
সুতরাং	এর জন্যে
যা কিছু পাওনা	তাঁরই প্রাপ্য :

ঠিক দোলনার দোলনের আভাস আসছে। দুদিকে প্রায় সমান ঝোঁক, তাই পর্বগুলির ভাষা-পরিমাণও যেন ডাইনে-বাঁয়ে জোড়ে-জোড়ে মিল, প্রত্যেক জোড়ায় একটি পর্বের ওজন বাড়লে অন্যটিরও বাড়ছে, একটির কমলে অন্যটিরও কমছে।

এক ধরনের ছড়াতেও এই দোলনার চালটি কিছু-কিছু লক্ষ করা যায়। এদের জোড়া-পর্বগুলির 'দল'সংখ্যা অনেক সময়েই অসমান, তবু এরা 'মাত্রাসমকত্বে'র আভাস আনে স্বরধ্বনির ওজন বাড়িয়ে-কমিয়ে। কখনো কখনো এদের হ্রস্ব পর্বগুলির 'মুক্তদলে'র বিস্ময়করভাবে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে :

আমার কথাটি ফুরু—ল
নটে গাছটি মুড়ু—ল
কেন রে নটে মুড়ু—লি
গরুতে কেন খা—য়

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দোলনার ছন্দটি ঠিক এই জিনিস নয়। এখানে বাঁ-দিকের পর্বগুলিকে দ্রুতভাবে ও ডানদিকের পর্বগুলিকে অত্যন্ত বিলম্বিত-ভাবে উচ্চারণ করে দুদিকের মাত্রাসমতা আনা হয়েছে, এবং মোটামুটি ছড়ার ছন্দের আদলটিই বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নীচে সব পর্বেরই ওজন মোটামুটি সমান ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃত উপরের বাক্যটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাতে সব পর্বের মাত্রা সমান রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, শুধু ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকের মোটামুটি মিল থাকলেই হল, উপরে-নীচে নয়। অবশ্যি এই 'দোলনার ছন্দে'র সঙ্গে ছড়ার ছন্দকে মিশিয়ে নিয়েও নানারকম বৈচিত্র্য এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এর একটি দৃষ্টান্ত তো 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে :

গাল চাপড়াচ্ছে আমার পা নাচাচ্ছে নিজের
ছড়া কাটার তালে তালে।

এতে দোলনার দোলও আছে, ছড়ার আদলও আছে। কিংবা 'শকুন্তলা'র ১৮ পৃষ্ঠা খুলতেই চোখে পড়ছে :

কেউ জালে ধরা পড়ল কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল
কেউ বা তলোয়ারে কাটা পড়ল

এখানেও প্রথম দুটি পর্বে 'দোলনার ছন্দে'র আভাস এসেছে, কিন্তু তারপর 'কেউ বা' কথাটিতে দোলন থেমে গিয়ে শেষ দুটি পর্বে ছড়ার তাল এসে

পড়েছে। আবার তাঁর গদ্যছন্দে লেখা 'পাহাড়িয়া' কবিতার প্রথমেই একটু অন্য ধরনের মিশ্রছন্দের একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে :

জেগে-ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে
পাখি,—

এখানে শেষ কথাটিতে দোলনার দোলন একেবারে থেমে গেল। তারপর :

একটি পাখি, না-দেখা পাখি, কানে-শোনা পাখি !

এ একেবারে 'টেনে-চলা ছন্দ' : প্রথম ঝোঁকে একটু টান, তারপরে আরেকটু বেশি, তারপরে সবচেয়ে বেশি। এই টানা সুরটুকু দীর্ঘ হতে-হতে চলেছে, এতে শুধু-যে না-দেখা পাখিটির একটানা সুরের আভাস ফুটে উঠেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা দূরত্বের আভাস আসছে,—পাখিটি হয়তো কাছেই কোথাও ডাকছে, তবু তাকে দেখা যাচ্ছে না—সে 'মনের মধ্যে অনেক দূর।'

লৌকিক ছন্দের 'দলমাত্রিক' পর্বকে বাক্‌পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে ও পর্বগুলিকে নিত্যনূতন ভঙ্গিতে সাজিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর পুঁথি-পালাগানগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবু তাঁর রূপকথাগুলিও বড়ো কম যায় না। তাঁর জীবনকাহিনীর বইগুলিতেও কথা বলার এই ঢঙ অনেক জায়গাতেই ধরা পড়ে।

বেহালার এক দুই তিন চার আর
ঘোড়া মলার টপ টপ ঠপ ঠপ,

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১৭

কিংবা—

ব্রহ্মা ওঠেন তো পড়েন,
হাঁপাতে হাঁপাতে পবনকে এসে বলেন

—মারুতির পুঁথি : পৃ ২৮

কিংবা—

তারপরে বাসর জাগরণ,
বানরী-বীণায় তার পরং,
তালি চটপটি বানরী-নর্তন
ও ডুগডুগি বাদন ;

—মারুতির পুঁথি : পৃ ১৯

এরকম অসংখ্য কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার যেখানে-সেখানে। আর দৃষ্টান্ত নয়, শুধু একটুখানি ধরিয়ে দিলাম। পাঠক নিজে বই নিয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে আরো নানারকম ঢঙ আবিষ্কার করে খুশি হবেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখতে চাই। গতি আর যতির সামঞ্জস্যই ছন্দের প্রাণ। পুনরাবর্তন ও প্রত্যাশা আমাদের মনে ছন্দবোধের উদ্রেক করে। কবিতার বেলা পর্বের মাত্রাসমকত্বের দ্বারা এবং ক্ষেত্রবিশেষে পংক্তির এমন-কি পদেরও অন্ত্যানুপ্রাসের ফলে—এই পুনরাবর্তন-সম্পৃক্ত প্রত্যাশা সার্থক হয়ে ওঠে। গদ্যে বাক্‌পর্বের মাত্রাসংখ্যা স্বভাবতই অসম, তাছাড়া বাক্যে অন্ত্যানুপ্রাসের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই এতে নিরূপিত মাত্রার ছন্দতালের কিংবা মিলের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার বহু স্থানেই এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত উদ্ধৃত অনেকগুলি দৃষ্টান্তেই—বিশেষ করে শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল ও জোড়াসাঁকোর ধারে'র উদ্ধৃতাংশে—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টে আরো কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল।

৯

কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত ধ্রুপদী চালের গম্ভীর রীতির গদ্যের কথা না বললে আলোচনার একটা দিক অসম্পূর্ণ থাকবে। এই রচনাগুলি বস্তুত প্রচলিত সাধুরীতির সমগোত্র, যদিও নিপুণ বাণীশিল্পী অনেক সময়ে এতে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপটিও ব্যবহার করতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প কয়েকটি রচনায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এটি তাঁর সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষাভঙ্গি না হলেও, এতেও তাঁর অসামান্য সৃষ্টিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ এই যে তাঁর এ-রচনাগুলি মুখ্যত হয় বৃহৎ নিসর্গচিত্রধর্মী নয় ভাস্কর্যধর্মী, এবং এইজন্যই তাঁর শিল্পপ্রতিভা এদের এমন একটি অনবদ্য বাণীরূপ দিতে পেরেছে। শিল্পরীতির বিচারে তাঁর এ-ভাষাও গীতিচিত্রধর্মী, তবে এ-গীতি ধ্রুপদ পর্যায়ের, আর এ-চিত্র বিশাল দৃশ্যপটের। তাঁর অসামান্য রূপদৃষ্টি ও মৌলিক মনোভঙ্গি এ-ভাষাতেও এক নূতন ঐশ্বর্য এনেছে। প্রথমে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ-বিশিষ্ট রচনার দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

> **একটুখানি আলোর আঘাত / নিশীথবীণায় সোনার তারের / একটুখানি তীব্র কম্পন। / উষার অচঞ্চল শিশির, / তার মাঝখানে / একটিবার স্থির**

হয়ে দাঁড়িয়েছি / নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। / পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত / অনেকখানি অন্ধকার / এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। / কৃষ্ণসার চর্মের মতো / একটি কোমল অন্ধকার, / তারই উপরে / আলোর পদক্ষেপ / ধীরে ধীরে পড়ছে। / সম্মুখে দেখা যাচ্ছে / একটি পদ্মের কলিকা / জলের মাঝখানে / স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ; / যেন ভূদেবী / বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

—পথে বিপথে : গিরিশিখরে : পৃ ১১৪

এ-রচনার সৌন্দর্য মুখে বলা যায় না। অন্ধকার রাত্রিশেষে বিশ্বব্যাপী গম্ভীর প্রশান্তির মাঝখানে পূর্বাকাশে প্রথম আলোর কম্পনটি ভাষার সূক্ষ্ম বীণাতারে আশ্চর্যভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। এ হল প্রকৃতির একটি স্থির শান্ত ছবি, এর মধ্যে সর্বত্র একটি সমাহিত ধ্যানের ভাব বিরাজ করছে। কিন্তু যেখানে স্থিতির মাঝখানে গতির ক্ষিপ্রবেগ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সেখানে এই ভাষাতেই আরেক ছন্দ আরেক সুর ধ্বনিত হয় :

ঠিক যেখানটি থেকে / সূর্যাস্তের নিচে/সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে/নদী একটি রুপোর তারের মতো / দেখা যায়, / সেখানটিতে পৌঁছে / পথ স্তূপাকার পাথরের উপর / হঠাৎ লম্ফ দিয়ে / পূবে মোড় নিয়ে / পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে / ছুটে নেমেছে।

—পথে বিপথে : বিচরণ : পৃ ১২৭

ছন্দের বেগ-পরিবর্তন ও আকস্মিক ওঠা-পড়াগুলি বন্ধুর পার্বত্যপ্রকৃতির দৃশ্যকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছে। এখানে আঁধার-চেরা নদীটি যেমন তরতর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, পাহাড়ে-পথটাও তেমনি লাফ দিয়ে পাথর ডিঙিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়ে পাহাড়ের অন্তদিক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

এবার তাঁর লেখা থেকে ক্রিয়াপদের সাধুরূপ-যুক্ত একটি বিস্ময়কর বর্ণনা উদ্ধৃত করে আমাদের বক্তব্য শেষ করে আনছি। বর্ণনাটি কোণার্কমন্দিরের। ভাষার সুগম্ভীর শব্দসঙ্গীতে সিন্ধুতরঙ্গের মতো ছন্দের অবিরাম ওঠা-পড়ার তালে তালে কোণার্কমন্দিরের প্রাচীন পাথরের ছন্দোময় রূপটি কী আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে! তার গম্ভীর প্রাণস্পন্দনটি মৃদঙ্গধ্বনির মতো আমাদের হৃৎপিণ্ডে এসে বাজছে :

পাথর বাজিতেছে / মৃদঙ্গের মন্দ্রবক্ষে, / পাথর চলিয়াছে / তেজীয়ান অশ্বের মতো / বেগে রথ টানিয়া, / উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে / নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো / [illegible] / সহস্র বন্ধে /

চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, / এই শব্দায়মান, / চলায়মান উর্বরতার / চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, / শোভা পাইতেছে / কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর / মানসশতদল— / সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, / নির্ভীক, / সতেজ, / আলোকের দিকে উন্মুখ।

—পথে বিপথে : সিন্ধুতীরে : গমনাগমন : পৃ ১০৯

এ একেবারে ক্লাসিক। অতি উচ্চাঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে বাণীর এই অপূর্ব ভাস্কর্যকর্মের তুলনা নেই। অবনীন্দ্রনাথ এখানে অদ্বিতীয় রূপদক্ষ,—ভারতশিল্পের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তির অমর দ্বাদশ-শত শিল্পীর যোগ্যতম প্রতিনিধি। তাঁর এ-সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা স্তম্ভিত হই।

অথচ তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মধ্যে এই একটিবার মাত্র আমরা তাঁকে প্রাচীন স্থাপত্যলোকের গৌরবময় শিল্পচূড়ায় অমর ভাস্কর-রূপে দাঁড়াতে দেখতে পাই, তারপর আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের পরিচিত জগতে। প্রথম জীবনে একবার তিনি গিয়েছিলেন প্রাচীন 'রাজকাহিনী'র দেশে, কিন্তু সে ইতিহাসের জগৎ, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নয়। তারপরে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গে কতবারই তো দেখা হয়েছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে, 'ঘরোয়া'য় : সেই পরিচিত মানুষটি, আলবোলার নলটি হাতে ধ'রে গল্প করছেন আসর জমিয়ে : মজলিশি মন, শৌখিন মেজাজ, কথা বলার সরস লৌকিক ঢঙ : বলছেন, 'নবাব ছেড়ে দাও, আমি নিজেও যে নবাবি করেছি এককালে।' তাঁর মনে ভেসে আসে কত স্মৃতির রেশ : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সেই দিন-বদলের পালা, কত উৎসব-আলোর রাত, কত সুখদুঃখের মেলা, চেনা-অচেনা কত মুখের ভিড়। সেই সঙ্গে মন চ'লে যায় অনেক দূরে—ছেলেবেলার সেই দিনগুলিতে, চোখে ভাসে সাবেক কালের রূপ, একটি বর্ষাসন্ধ্যা, দাসীদের 'পিদিম' জ্বালানো, কানে ভেসে আসে পদ্মদাসীর ছড়া-কাটার সুর। কত বড়ো শিল্পীর মন : জ্বলে ওঠে কল্পনার আলো, স্মৃতি হয়ে ওঠে ছবি, ছবি হয়ে ওঠে কথা, কথা হয়ে ওঠে হাজার-বাতি-জ্বালা অপরূপ রূপকথা।

রূপ ও রূপানুষঙ্গ

১

ছেলেবেলা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের মনটা ছিল 'চোখে ভরা'। যা-কিছু দেখতেন যা-কিছু ভাবতেন সবি তাঁর মনে ছবি হয়ে উঠত, আর তাঁর কথার মধ্যে ফুটে উঠত সেই ছবির ব্যঞ্জনা। তাঁর ছেলেবেলাকার স্মৃতিকথা তো সবটাই ছায়াছবির খেলা। কতকগুলি ছবি একেবারে বাস্তব, আর কতকগুলিতে মিশে আছে তাঁর বালক-মনের কল্পনা।

একেবারে শিশুকালের স্মৃতিই ধরা যাক, তখনো তাঁর ছোটো জগৎটি পুরনো তেতলা বাড়ির উপরকার উত্তর-পুব কোণের সেই একটি-মাত্র ঘরে সীমাবদ্ধ। তাঁর শিশু-চোখ বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখত—এক কোণে জলছে মিটমিটে একটা তেলের সেজ, লাল খেরুয়ার পুরু পর্দা দিয়ে মোড়া ঘরের তিনটে জানালা, ঘরজোড়া উঁচু একখানা খাট---তাতে সবুজ রঙের দিশি মশারি ফেলা, দরজার কাছে একটা লোহার সিন্দুক, তার সামনেই হাত তিনেক উঁচু একটা কাঠের খোঁটা, তার উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেড়হাত প্রমাণ একটা ছেলে, খোঁটার মাথার কাছে কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত —তার মধ্যে কী আছে কে জানে। কিন্তু যে-কটা জিনিস তাঁর স্মৃতির পটে ভেসে উঠেছে তার সবটাই তো ছবি। এই পরিবেশে তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষটি ছিল তাঁর পদ্মদাসী, তার কথা কোনো দিন ভুলতে পারেন নি তিনি। বলছেন :

> আলোর কাছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্মদাসী মস্ত একটা রূপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে---তুলছে আর ঢালছে সেই তপ্ত দুধ। দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে।

আপন কথা, পৃ ৬

শিশুকালে তাকে ছাড়া একদণ্ডও চলত না তাঁর। সকালে ঘুম ভাঙানো থেকে রাত্রে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত তাঁর সব কাজের দায়িত্বই ছিল পদ্মদাসীর। তার সারাদিনের টুকটাক কাজের কত ছবি ধরা পড়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। উপসংহারে বলছেন:—

> কোন্ গাঁয়ের কোন্ ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী। আপনার কথা বলতে গিয়ে সেই নিতান্ত পর এবং একান্ত দূর যে তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চান্ন বছরের ওধারে বসে সে দুধ ঢালছে আর তুলছে আমার জন্যে।…
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৩

এসব হল বাস্তব অভিজ্ঞতার ছবি। আর তাঁর শিশু-মনের খেয়ালি কল্পনার কত ছবিই তো ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: দাসী মশারীর মধ্যে ছেলেকে শুইয়ে রেখে গেছে ঘুমোবার জন্যে, কিন্তু ছেলের চোখে ঘুম কোথায়?

> চারিদিকে সবুজ মশারির আবছায়া ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারি নতুন ঠেকেছিল সেদিন। একটা যেন কোনো নতুন দেশে এসেছি—সেখানে বালিশগুলোকে দেখাচ্ছে পাহাড়-পর্বত, মশারিটা যেন সবুজ কুয়াশা-ঢাকা আকাশ।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮

এরকম অদ্ভুত কল্পনা শিশু-অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। যা হোক্ এ হল বড়ো অভিযানের কথা: বালিশ-বিছানার মধ্যে নূতন দেশ আবিষ্কারের কাহিনী। আবার এই বিছানার রাজ্যেই এমন-সব ছোটো ঘটনাও ঘটে, শিশুর কৌতূহলী চোখে যার বিস্ময় বড়োকেও ছাড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক বিন্দু আলো এসে পড়েছে মাথার বালিশের উপরে, তাকে ধরতে যেতেই শুরু হয়ে গেল এক অবাক কাণ্ড—

> সাদা প্রজাপতির মতো একফোঁটা আলো মাথার বালিশে ডানা বন্ধ করে ঘুমায় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপরে শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৭-১৮

উপরের ছবি দুটিতে তবু বাস্তবের ছোঁওয়া খানিকটা আছে: বালিশ, মশারি কিংবা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে গলে-আসা একটুকু আলো—এদের উপলক্ষ করেই বাকিটা সৃষ্টি করে চলেছে শিশুর মন। কিন্তু আগাগোড়াই কল্পনার

চোখে দেখা—এরকম ছবিরও অভাব নেই। একটা তো এখনই মনে পড়ছে—

> ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল…কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোঁক গেলে; যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো হাত দুটো পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৯

এই ভীষণ মূর্তিটাকে কে না ভয় করবে? কিন্তু এ প্রসঙ্গ আপাতত থাক।

অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ মন আর কৌতূহলী চোখ ছেলেবেলায় সব-কিছুকে কী দৃষ্টিতে দেখত উপরের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই তার আভাস পাওয়া যাবে। এই মন আর চোখ নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি আর এরাই ছিল তাঁর আজীবন সঙ্গী। তাঁর প্রাণ ছিল ইন্দ্রিয়চেতনায় সজাগ, তাঁর কাছে প্রত্যেকটি অনুভূতি ছিল জীবন্ত, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা এক পরম বিস্ময়। তাঁর মতে শিল্পসাধনার একেবারে গোড়ার কথাটি হচ্ছে—

> চোখকে খুলে রাখতেই হয় প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয় মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়—কল্পলোকে ও বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে।
>
> —বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী, পৃ ১

তিনি মনে করেন শিশু আর কবি-শিল্পীর মধ্যে একটা বিষয়ে মিল রয়েছে, সেটা দৃষ্টির তারুণ্য। তফাত শুধু এই যে, শিশু তার চোখের সামনে নিত্য নূতন বিস্ময়ের বস্তু নিজে দেখেই তৃপ্ত, আর কবি-শিল্পী তার সেই বিস্ময়কেই সকলের অনুভবগম্য করে তোলেন আপন শিল্পসৃষ্টির কৌশলে। তিনি বলেন—

> দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখে নি আর একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কি কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণ দৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ,, পৃ ৩৬

বস্তুত শিল্পকৌশলের ভিতরকার রহস্যটি বাইরে থেকে জানবার উপায় নেই। তার মূল লুকিয়ে আছে শিল্পিমানসের গভীরে। শিল্পপ্রকরণের বিচার-বিশ্লেষণ করে আমরা যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করি তা শিল্পবস্তুর বহিরঙ্গ পরিচয় মাত্র।

এ তো গেল দৃষ্টিচেতনার দিক্ থেকে শিশু আর কবি-শিল্পীর প্রকৃতিগত

মিলের কথা। এবার দেখা যাক চিত্ররচনার ক্ষেত্রে কবি ও শিল্পীর বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ কী বলতে চান।

ছবি আর কথা যে এক জিনিস নয় সে তো বলাই বাহুল্য। আগেই বলেছি,[১] ছবি আমরা দেখি চোখে—স্থানের সহভাবে, আর কথা আমরা শুনি কানে কালের অনুক্রমে। দুই পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের অধীন এরা দুটি পৃথক্ রাজ্য। তবে অবনীন্দ্রনাথ বলেন, রাজ্য দুটি ভিন্ন হলেও এদের মাঝখানকার সীমারেখা অলঙ্ঘ্য নয়, সেখানে চলাচলের একটা রাস্তা খোলা আছে। তা ছাড়া এ দুটি রাজ্যকে তিনি একেবারে পরস্পর-নিরপেক্ষ বলেও স্বীকার করেন না। তাঁর মতে ছবিও কথা বলে। যে-ছবি কথা বলে না সে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। তবে ছবির ভাষা কানে শোনা যায় না, শুনতে হয় মন দিয়ে—

> চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো, মন শুনে চলল কানের অপেক্ষা না করে ছবি যা বললে তা।…
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৬

খণ্ডিত ছবি আর কথা-কওয়া ছবির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—

> সুর সার কথাবার্তা এদের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো যদি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা-একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ করে থাকে, বলে না চলে না—পিদুম, ফুল, ফুলদানি…এর বেশি নয়; কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্তে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠল, —"নির্বাণদীপে কিম্ তৈলদানম্।" —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৭

অন্যদিকে কথাও ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে, তবে সে ছবি চোখে দেখা যায় না, দেখতে হয় মন দিয়ে। "…'নবঘনশ্যাম' কথাটা রূপ ও রঙ দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।" কবির ভাষা ও ছবির ভাষার তুলনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—

> কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা দিয়ে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৫

এই ইঙ্গিতের সাহায্যে ছবির ভাষাও চলেছে মনেরই দিকে। ইঙ্গিতই হল সেই আশ্চর্য জাদুকাঠি যার ছোঁওয়ায় কবির ভাষা হয়ে ওঠে ছবি, আর ছবির ভাষা হয়ে ওঠে কবিতা। দুয়েরই সৃষ্টি হয় মনের মধ্যে, দুটিই মানসী মায়া। তাই অবনীন্দ্রনাথ অতি সহজেই বলতে পারেন—

> শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্ যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৬

এখানে একটা কথা ব'লে রাখা প্রয়োজন। সব ছবি যেমন স্পষ্ট ক'রে কথা বলতে পারে না, সব ভাষাও তেমনি সার্থকভাবে ছবি ফোটাতে পারে না। ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য বিচার ক'রে অবনীন্দ্রনাথ ভাষাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রেছেন, একটিকে বলেছেন 'বাচন' আর-একটিকে 'বর্ণন'; আলোচনাত্মক মননধর্মী সাহিত্যে 'বাচনে'র প্রাধান্য, আর সৃষ্টিমূলক রঞ্জনধর্মী সাহিত্যে 'বর্ণনে'র। যে-ভাষা সার্থক ছবি হয়ে ওঠে তার মধ্যে থাকবে সেই 'বর্ণন'-গুণ যা মনের কাছে দৃষ্টিচেতনার ইঙ্গিতবাহী। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা মুখ্যত এই 'বর্ণনে'র ভাষা, আর তাঁর বেশির ভাগ কথাই চিত্রাত্মক। তাঁর রূপকথা, ছড়া, পুঁথি ও পালাগান থেকে শুরু ক'রে স্মৃতিকথা, ছোটদের উপন্যাস, ছোটদের নাটক, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী পর্যন্ত সব লেখা সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য। এমন-কি 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'র মতো মননধর্মী রচনাতেও একটু পরে-পরেই আলোচনার দুর্গম পথটি আলো করে রয়েছে তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপ।

২

আমরা আগেই বলেছি, রূপ দেখার চোখ নিয়েই জন্মেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর একেবারে গোড়ার দিকে লেখা 'শকুন্তলা' আর 'ক্ষীরের পুতুল'-ই তার প্রমাণ। বাণীচিত্রের বাক্‌ছন্দ বিচার প্রসঙ্গে এদের কতকগুলি ছবি নিয়ে আলোচনা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। তাছাড়া এদের বাক্‌পর্ব-গঠনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রে আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে পরিশিষ্টে। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনার সূচনাতে তাঁর এই প্রথম দুখানি বইয়ের আরো কয়েকটি ছবির উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'[২] বস্তুত সহজ ছবি আঁকাও সহজ নয়। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'শকুন্তলা'তে-ই তাঁর মুখের স্বাভাবিক ভাষাটি অতি সহজেই ছবি হয়ে উঠেছে—

> গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোটো ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল।··· —পৃ ১৬

এখানে বনের পাখিদের প্রাণের ছন্দটি যেন আপনা থেকে এসে ধরা দিয়েছে তাঁর হাতে। আবার সামান্য দু'চারটি কথার আঁচড়ে রাজার মৃগয়াযাত্রার সামগ্রিক ছবিটি কেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে—

> ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল নিয়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। —পৃ ১৮

যখন গহন বনে চলেছে এই শিকারের ব্যস্ততা, তপোবন-প্রকৃতি তখন একেবারে শান্ত—

> গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল;

আর—

> শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন্‌গুন্‌ গল্প করছিল। —পৃ ১৯

আবার 'শকুন্তলা'য় এমন অনেক স্নিগ্ধ ছবি আছে যা কল্পচক্ষু মুগ্ধ ক'রে যায়। শচীতীর্থের জলে শকুন্তলার স্নানের ছবিটিই মন্দ কী ?—

> সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। —পৃ ৩৫

নরম তুলির হালকা ছোঁওয়ায় আলতোভাবে আঁকা এই জলরঙের ছবিটির তুলনা কোথায় ?

'ক্ষীরের পুতুল' তো আগাগোড়াই 'রঙ-রেখার রূপকথা।' তাতে আবার সোনার রঙটাই বেশি ক'রে চোখে পড়ে—

> সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল। —পৃ ১১

কিংবা—

> ছোটোরাণী···সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে, সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন··· —পৃ ১৫

অবশ্য সোনা ছাড়া অন্য রকম রঙও আছে। অনেক ছবিতে মণিমুক্তোর বিচিত্র বর্ণালি ঠিকরে পড়ছে। মনে পড়ে মাণিকের দেশের সেই আশ্চর্য দুটি পায়রার কথা—

> তাদের মুক্তোর পা; মানিকের ঠোঁট; পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। —পৃ ১৩

কিংবা সেই অচিন দেশের নাম-না-জানা রাজকন্তের মায়া-উপবনের নীল গুটিপোকার কথা—

> নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে। —পৃ ১৪

হয়তো রূপকথা ব'লেই 'ক্ষীরের পুতুলে' এত-সব উজ্জ্বল রঙের ভিড়। কিন্তু তাই-বা বলি কী ক'রে? 'রাজকাহিনী'র ইতিহাস-কথাতেও বহু স্থানেই রঙের দীপ্তি ঝলমল করছে—

> চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথর দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি-কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। —পৃ ১৫

অলৌকিক আবির্ভাবের চিত্র ব'লে এ-ছবিকে অনেকে রূপকথার সমপর্যায়ের ব'লে মনে করতে পারেন। কিন্তু—

> লক্ষ্মণ সিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলংকারে, অসংখ্য অসংখ্য মণিমাণিক্যে হাজার হাজার আগুনের শিখার মতো দপ-দপ করে জ্বলতে লাগল। —পৃ ৯০

কিংবা—

> মহারাজের রাজহস্তী…তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরীর বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতের দু'শো বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল।
>
> —পৃ ৪১

অথবা পদ্মিনীর মূর্তি—

> বাঁকা মল-পরা কী সুন্দর দুখানি পা, ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক্! —পৃ ৭৭

এসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের চিত্রকেই উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়েছে। বস্তুত ইতিহাস-ভিত্তিক হলেও রাজকাহিনীর সর্বত্রই লেগেছে অবনীন্দ্রনাথের আপন তুলির ছোঁওয়া। তাঁর কল্পনার রঙে আঁকা শত-শত ছবি ফুটে উঠেছে বইখানিতে। তার পাতায় পাতায় ছবি, কথায় কথায় ছবি—

> বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে (পৃ ১৪১); সেই ছুরি শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভিলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল (পৃ ৩৬); পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে (পৃ ১২১); গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকমক করছে (পৃ ৪৯); মহর্ষির দুটি চোখ সকালবেলার পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল (পৃ ৪৯)।

—এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আর কেবল একটি অসামান্য ছবির উল্লেখ ক'রে 'রাজকাহিনী'র প্রসঙ্গ শেষ করছি—

> …বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল… কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর…আগুনের মতো একটা তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে… —পৃ ৪২

কী বলিষ্ঠ ছবি! প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর কাজ। তুলির প্রত্যেকটি টান অব্যর্থ।

৩

থাক পুরাণ-কথা, রূপকথা, ইতিহাস-কথা। আসা যাক চলতি কালের ভ্রমণবৃত্তান্তে। পথ-চল্‌তি টুকরো-দেখার অগুন্‌তি টুকরো-ছবি হীরের কুচির মতো ছড়িয়ে আছে 'পথে বিপথে'র কাহিনীগুলিতে। কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা দেখি ?—

> জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে (পৃ ৭); একটা সাদা পাখি ঢেউয়ের উপর পদ্ম থেকে ছেঁড়া পাপড়ির মতো ভেসে বেড়াচ্ছে (পৃ ১৯); বসন্ত-বাউরির সবে-ওঠা কচি ডানার মতো হলদে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে (পৃ ১৫); বসন্তের ফুলে ফুলে বিছানো ফুলশয্যার চাদরখানার মতো সেই অপূর্ব শালটি উড়তে উড়তে জলে গিয়ে পড়ল (পৃ ৫০); তার চোখ দুটো দেখলেম যেন একটা স্বপ্নের জাল দিয়ে ঢাকা (পৃ ১৬); আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজলরেখার কোণে একটুখানি অরুণ-আভা (পৃ ১২৪); আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো (পৃ ১২৪)।

এ হল এক ধরনের ছবি—তুলির কয়েকটি ছোটো-ছোটো আঁচড়ে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে আঁকা। আবার 'পথে বিপথে'র অনেক স্থানে ধীরে-সুস্থে রসিয়ে-রসিয়ে আঁকা ছবিও দেখতে পাওয়া যায়। বলতে-বলতেই চোখে ভাসছে শারদ নবমীর নিশি-প্রভাতে একটি পার্বত্য দিনের আলেখ্য :

> আজ আমাদের সে-দেশে নবমীর নিশি প্রভাত হল; এখানে শরতের সাদা মেঘের দুখানা ডানা নীল আকাশে ছড়িয়ে আজকের দিনটি যেন কৈলাসের তুষারে-গড়া একটি শ্বেত-ময়ূরের মতো কার ফিরে-আসার পথ চেয়ে পর্বতের চারিদিকে কেবলই উড়ে বেড়াচ্ছে। —পৃ ১৩২

এসব ছবি, শিল্পী একটু-একটু ক'রে আঁকেন, আর তুলির প্রত্যেকটি টান তাঁর ধ্যানের সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখেন। এ-ধরনের ছবি বিলম্বিত লয়ের, ধ্রুপদী ঢঙের—তাই ভাষার গতিমন্থর সাধুরীতিও সহজেই এর বাহন হতে পারে। তাতেও অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। কোণার্ক-মন্দিরের বর্ণনার মূল অংশটির তো কথাই নেই—বাক্‌ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তিতে উদ্ধৃত করেছি—এমন-কি সেখানকার বিদায়কালীন দৃশ্যটিও মহাকালের মানসপটে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে আছে—

> কোণার্ক আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছে। মরুশয্যায় অর্ধনিমগ্না পড়িয়া আছে সে পাষাণী অহল্যার মতো সুন্দরী—নীরব, নিস্পন্দ, মণিদর্পণে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া, দিগন্তজোড়া মেঘের ম্লান আলোয় যুগযুগান্তরব্যাপী প্রতীক্ষার মতো; শতসহস্রের গমনাগমনের এক প্রান্তে একটি-কণা পদরেণুর প্রত্যাশী! —পৃ ১১০

বস্তুত 'পথে বিপথে'র বেশির ভাগ রচনাই লেখকের ভ্রমণকালীন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশ্রয়ী ভাব-ভাবনাকে মূর্ত ও জীবন্ত ক'রে তুলেছে।

৪

প্রকৃত রূপদ্রষ্টার কাছে সুরূপ কুরূপ ব'লে কোনো কথা নেই, সবই রূপ। প্রকাশই তার শেষ কথা। তাই সাধারণ দৃষ্টির ছাপ-মারা 'সুন্দর' 'অসুন্দর' দুটির প্রতিই তাঁর সমান আকর্ষণ, দুটিকেই তিনি তাঁর শিল্পক্ষেত্রে সমান আগ্রহে বরণ করেন। মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, নিসর্গদৃশ্য—এসব বাস্তব রূপের বেলা তো বটেই, এমন-কি সম্ভাব্য কল্পিত রূপের বেলাও এ-কথা সত্য। তাঁর ধ্যানে ঘোড়া আর পক্ষিরাজ তুল্যমূল্য, নারী ও অপ্সরী দুইকেই তিনি স্বীকার করেন; রূপময় প্রকাশের দিক্ থেকে মানুষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস সকলকেই তিনি দেন সমান মর্যাদা। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ধরা যাক নিসর্গদৃশ্য: অবনীন্দ্রনাথের দুটি প্রভাত-বর্ণনা। একটিতে দেখি—

> সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানী রঙে সবুজ হয়ে উঠল। মেঘগুলোতে কমলা রঙ আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুমফুলের গোলাপী আভা পড়ল...কাছের ক্ষেতের উপরে চট করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউ গাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল।...
>
> —আলোর ফুলকি, পৃ ৪৫

অন্যটিতে দেখতে পাই—

> সকালে সূর্য উঠল—কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া। তারপর দশদিন ধরে আর কিছু দেখা যায় না। দশদিন পরে সূর্য উঠল তেলের মতো হলুদ-গোলা আকাশে একটিবার—তার পরেই

লোহার কস্‌-ধরা কালো মেঘের রথ সূর্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণ মুখে চলে গেল।

—মারুতির পুঁথি, পৃ ৪৫

সাধারণ চোখের কাছে প্রথম ছবিটি সুন্দর, দ্বিতীয়টি নয়। কিন্তু শিল্পীর ধ্যানী চোখে দুটি ছবিই চমৎকার। দুটিকেই তিনি এঁকেছেন সমান যত্ন নিয়ে, সমান আদরে।

কিংবা ধরা যাক পাখির ছবি। 'আলোর ফুলকি' আর 'বুড়ো আংলা' তো পাখিদেরই জগৎ, তার থেকেই দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একদিকে রয়েছে 'আলোর ফুলকি'র কুঁকড়ো, তার চার বউ, আর সোনালিয়া; অন্যদিকে 'বুড়ো আংলা'র গাং-শালিখ, গো-শালিখ, ছাতারে আর বুনো হাঁসের দল। আগুনের মতো রগরগে 'মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা' কুঁকড়োর তো কথাই নেই, তার চার বউও কম বাহারি নয়: 'মেমসাহেবের মতো গোলাপী ফিতে মাথায় বাঁধা··· সাদা ঘাঘরা-পরা' সাদি; 'কালতে ঠাকরুণে'র মতো 'চোখে কাজল আর নীলাম্বরী শাড়ি-পরা, মাথায় সোনালি মোড়া বেনে খোঁপা'-বাঁধা কালি; কনে বউটির মতো 'ঠোঁটে আলতা'-মাখা 'গোলাপী শাড়ি-পরা' সুরকি; আর 'আয়া'র মতো 'ধুপছায়া রঙের সায়া-জড়ানো' খাকি (পৃ ১)—সকলেই সুন্দরী। কিন্তু সবাইকে হার মানিয়েছে কুঁকড়োর 'মনো মোনালিয়া সোনালিয়া।' 'নন্দন কাননের সূর্যের লাল আভা রক্ত-চন্নন আর কুসুম ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে' রেখেছে সে (পৃ ২১)। কুঁকড়োর ভয়, 'পাছে পাতার সবুজ, ফুলের গোলাবি, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলোয় গড়া এই আশ্চর্য পাখিটি জল পেয়ে গলে যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায়' (পৃ ১৮)।

এ হল একদিকের ছবি। অন্য দিকে 'বুড়ো আংলা'য় দেখছি, গাং-শালিখ, গো-শালিখ, ছাতারে 'গাছের তলায় শুকনো পাতা উল্টে-উল্টে কিড়িং কড়িং ধ'রে বেড়াচ্ছে' (পৃ ৫৩)। ওদিকে 'এক কুড়ি বুনো হাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে···বুনো হাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোঁট্টা-কাঠখোট্টা-গোছের। এদের গায়ের রঙ ধুলোবালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরি, ওখানে খাকির ছোপ। তাদের চোখ দেখলে ভয় হয়—হলুদবর্ণ—যেন গুলের আগুন জলছে! এরা চলছে খটমট চটপট—যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী—চ্যাটালো, কেটো-কেটো, ফাটা-চটা—হতকুৎসিত!' (পৃ ৪২)

সাধারণ দৃষ্টিতে এই বুনোগুলো 'আলোর ফুলকি'র পাখিদের পাশে দাঁড়াতেই

পারে না। কিন্তু শিল্পী জানেন বিশ্বসৃষ্টিতে ঐ 'হতকুৎসিতে'রও যথাযোগ্য স্থান আছে, আর তাদের বিশিষ্ট রূপটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে শিল্পীর দরদ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এতটুকু কম হলে চলবে না। রূপের রাজ্যে সবচেয়ে বড়ো কথা 'বৈচিত্র্য' : সুন্দর অসুন্দর দুটোই আপেক্ষিক। এখানে 'লাল-টুপি-পরা কাঠঠোকরা' (বুড়ো আংলা, পৃ ৫৩) কিংবা 'লাল টুপি নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরা মাছরাঙা'র (বুড়ো আংলা, পৃ ১০৭) ঝাঁক যেমন চমৎকার, তেমনি চমৎকার 'লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়ানো হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং', তার দুই সেনাপতি 'চুপিম-পা আর চোরম-পা' আর তার সভাপণ্ডিত 'চুহুংমুং' (বুড়ো আংলা, পৃ ১৩০)। আবার তেমনি বিস্ময়কর—অন্ধকারে 'লাল নীল হলদে সবুজ চোখ জালিয়ে' গাছে গাছে উড়ে বেড়ানো 'ধুধুল পেঁচা, কাল্ পেঁচা, কুটুরে পেঁচা এবং হুতুমথুমো' (আলোব ফুলকি, পৃ ৫০-৫২)।

আরো একটা কথা : কতকগুলি রস—বিশেষ করে হাস্যরস—সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পীকে অনেক সময় শিল্পের প্রয়োজনে বাস্তবের উপরে অতিরিক্ত পরিমাণে রঙ চড়াতে হয়। আলোর ফুলকিতে আমরা দেশ-বিদেশের অদ্ভুত ধরনেব মোরগের যে ভিড়টা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে তাই—

> কারু লেজের পালক মেপে সাত গজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুঁটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরীর তাজ, কারু এক চোখে চশমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা, কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারু বা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারে না··· —পৃ ৬০

এ হল অতিরঞ্জিত বর্ণনার দৃষ্টান্ত। তবে এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিল্প কোনো অবস্থাতেই বাইরের দৃশ্যের অবিকল অনুকরণ নয়, তার জন্যে রয়েছে আলোকচিত্র। শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য, বস্তুর বাহ্যরূপের আবরণ উন্মোচন করে তার অন্তরের ভাবসত্যকে প্রত্যক্ষ করা এবং নিজের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকে রূপায়িত করা।

উপরের ছবিটার তবু একটা বাস্তব ভিত্তি আছে—দৃশ্যরূপের সঙ্গে শিল্পীকে খানিকটা বস্তুসাদৃশ্য রক্ষা করতে হয়েছে—কিন্তু ছবির বিষয় যেখানে আগাগোড়াই কল্পনা, অবনীন্দ্রনাথ সেখানে একেবারেই নিরঙ্কুশ। 'মারুতির পুঁথি', 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'—এসব বইয়ে রাক্ষস-রাক্ষসীর ভিড়ে পথ চলা দায়, ঠাকুর-দেবতারাও

এক হাত বাড়া। আর 'ভূতপত্‌রীর দেশ' তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভূত আর কিম্ভুতেরই রাজত্ব, বইটির নাট্যরূপে এদের উৎপাত আরো দ্বিগুণ বেড়েছে। দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করতে হলে কেবল এই নিয়েই একখানা বই লিখতে হয়, তাই লোভ সম্বরণ করছি। কিন্তু নিতান্ত প্রাকৃত ঘটনাকেও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে রহস্যময় ক'রে তুলতে অবনীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। একে তাঁর 'অন্যতম স্বভাব' বললেও' অত্যুক্তি হয় না। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' থেকে এর সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

> মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেরালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে (পৃ ৭), সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! · পালকি ধরে বীর-বাতাস এক-একবার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর হাঁক দিচ্ছি, 'সামাল সামাল!' (পৃ ৮), একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড়ো বড়ো কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপর মাছ ধরছিল···এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শীতে গেঁথে (পৃ ১১), লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে···মনসাবুড়োর গা বেয়ে শাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে (পৃ ১১), নীল জলে দেখছি একরাশ কাঁচের টুকরোর মতো চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চকচক করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে (পৃ ২০)।

অন্ধকার রাতে শেওড়াঝোপকে কালো বিড়াল ব'লে ভ্রম হওয়া, পালকিতে যেতে ঝোড়ো হাওয়ার প্রবল ঝাপটা অনুভব করা, চাদরের খুঁট হাওয়ায় উড়ে গিয়ে মনসাগাছের কাঁটায় গেঁথে যাওয়া, লাঠির খোঁচা লেগে মনসাগাছের ক্ষত স্থান থেকে সাদা কস্ বেরিয়ে আসা, কিংবা জলের উপরে কিছুক্ষণ চাঁদের ভাঙা আলোর খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আকাশে তাকিয়ে অষ্টমীর আধখানা চাঁদ চোখে পড়া—এদের কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়, অথচ ছবিগুলো এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে মনে হয় প্রত্যেকটি ঘটনাই ভুতুড়ে।

আবার ঠিক ভুতুড়ে নয়, তবু অতিপ্রাকৃতের কাছাকাছি আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে 'দেয়ালা'। অবনীন্দ্রনাথের চোখে আকাশ, মেঘ, তারা, রোদ, গাছপালা, ফুল, গাছের ছায়া, মাঠ-ঘাট—এরা সবাই দেয়ালা করে। এ এক অবাক কাণ্ড! 'একে তিন তিনে এক' থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানা মেঘ, একবার সে রঙীন আলোয় রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল (পৃ ৩৪); এক-একসময় বাতাস এসে আমাদের ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে, —দেয়ালা করছে আমাদের ফুল (পৃ ৩৮); গাছপালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিমঝিম করতে থাকে আর একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে, হাসে, কাঁদে, চায় আর ঘুমোয় (পৃ ৩৬); টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক দিয়ে থেকে-থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ-ওপাশ (পৃ ৩৭); তারাগুলো থেকে-থেকে দেয়ালা করে আর চায় আর ভাবে গেল কোথায় ? (পৃ ৩৬); রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বললে—বলব না (পৃ ৩৫)।

আর দরকার নেই। এবার যেতে হবে নূতন প্রসঙ্গে।

৫

অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা এ-পর্যন্ত যত ছবির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছি— তা সে বাস্তবই হোক আর কল্পনাই হোক—লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের বিষয়গুলি মুখ্যত দৃষ্টিচেতনার এলেকার, অর্থাৎ তারা একান্তই চোখে দেখার ব্যাপার। শব্দার্থ থেকেই এসব দৃশ্যরূপের প্রতীতি জন্মে। আসলে এটা ভাষার শব্দ-প্রতীকাশ্রয়ী ইঙ্গিতের ক্রিয়া, তবে সোজাসুজি শব্দার্থ থেকে আসে বলে একে বলতে পারি 'সরল ইঙ্গিত'। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—'কাগবগ বললেই কালো সাদা দুই পাখি এসে হাজির' (বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃ ৪৬) এই ছোটো একটি কথায় চিত্ররূপায়ণের ক্ষেত্রে ভাষার 'সরল ইঙ্গিতে'র ক্রিয়ার সবটাই বলা হয়েছে। আবার বর্ণিত মূল বিষয়টি শ্রুতিচেতনার এলেকাভুক্ত, অথচ শব্দটি শোনামাত্র রূপচেতনার উদ্রেক হচ্ছে—এরকম ঘটনাও মোটেই বিরল নয়। একে বলতে পারি ভাষার 'তির্যক ইঙ্গিত'। এই তির্যক ইঙ্গিতের বহুল প্রয়োগ অবনীন্দ্রনাথের বাণীচিত্রে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য এনেছে। আলোচনা শুরু করবার আগে সামান্য দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বক্তব্যটি বিশদ করা যাক :

শব্দার্থের সরল ইঙ্গিতে 'কাক' বলতে আমাদের চোখে ভাসে কাকের ছবি, 'কোকিল' বলতেই দেখি কোকিল। কিন্তু অনেক সময় কাকের কণ্ঠে

উচ্চারিত 'কা—' স্বরটিও আমাদের চোখের সামনে পুরো কাকটাকেই টেনে নিয়ে আসে, 'কুহু' শুনলেই দেখতে পাই কোকিলের চেহারা। আসলে ব্যাপারটি অনুষঙ্গের (association)। শিশুর মনে এ-ক্রিয়া শুরু হয় বুদ্ধি-উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই। 'প্যাক্ প্যাক্' বলতেই সে দেখে হাঁস, 'ভৌ' বলতেই দেখে কুকুর, 'হাম্বা' বলতেই দেখে গোরু। রেলগাড়ি তার কাছে 'পোঁ ঝিক্ ঝিক্', আর মোটরগাড়ি 'ভর্‌র্‌র্ ভোঁ ভোঁ'।

শ্রুতি* ও দৃষ্টি-চেতনার এই পারস্পরিক অনুষঙ্গকে অতি আশ্চর্যভাবে কাজে লাগিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, যানবাহন, রাক্ষস-খোক্কসের যত বিচিত্র ছবি ধরা পড়েছে তাঁর লেখায় তাদের বেশির ভাগই জীবন্ত হয়ে উঠেছে শব্দের চিত্রানুষঙ্গের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। দৃশ্যরূপকে অর্থপূর্ণ ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে এই ইঙ্গিতময় শব্দধ্বনি তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এর প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—

> এতটুকু 'টোটো' ছেলেটা বোবা নটের মতো নানা অঙ্গভঙ্গি করে চলল, ভেবেই পাইনে তার অর্থ। হঠাৎ অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শিশুনট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে, অং অং ভুস্ ভুস্, বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্…লাগ লাগ ভোজবাজি…কথিত ভাষার আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিত জাদুমন্ত্রে কথা কয়ে ফেললে।

'শিশুনটে'র এই অসংলগ্ন কথাগুলি লক্ষ্য করবার মতো। 'অং অং' বলতেই দেখি, যেন কেউ মন্ত্রপাঠ করছে; 'ভুস্ ভুস্' শুনতেই চোখে ভাসে, যেন একটা ইঞ্জিন ছুটে যাচ্ছে; 'বোঁ বন্ বন্'—যেন একটা লাটিম ঘুরছে; 'সোঁ সন্ সন্'—যেন গাছপালার ভিতর দিয়ে জোর হাওয়া বইছে,—আর সব মিলিয়ে ছেলেটার মনের মধ্যে 'লাগ লাগ ভোজবাজি!' সত্যি বলতে, আমাদের মনেও খানিকটা লেগেছে এই ভোজবাজির ছোঁওয়া। ফলে, এই 'টোটো' স্বভাবের ছেলেটার দুরন্ত শিশুমূর্তি আমাদের চোখে এবার আরো স্পষ্ট, আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। পশুপাখির ডাক, নৈসর্গিক শব্দ, যানবাহনের শব্দ—এসব ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা যেসব ধ্বন্যুক্তি ব্যবহার করি সেগুলো মূল ধ্বনির শব্দসাদৃশ্যে কল্পিত। 'কা—' ধ্বনিটি কাকের কণ্ঠস্বরের হুবহু শব্দপ্রতিরূপ নয়, কল্পিত সাদৃশ্যমাত্র। কাক সাধারণত কণ্ঠ্য 'আ—', স্বরটিই উচ্চারণ করে, তার থেকে আমরা কল্পনা করে নিই 'কা—'। অবশ্য

কাকের গলায় সুর না-থাকলেও স্বরবৈচিত্র্য আছে : 'আ' ছাড়াও—আও, অও, অয়, অএ, ওআ, ওআও প্রভৃতি নানারকম যুগ্মস্বরধ্বনিও কাকের কণ্ঠে শোনা যায়। 'খনার বচন' আর 'কাকচরিত্রে' এর থেকেই কল্পিত হয়েছে—যা, না, পা, আও, যাও, কও, যাওয়া ইত্যাদি অর্থবোধক শব্দ। মানুষ আপন স্বভাববশেই এসব ধ্বনিকে তার নিজের ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে নেয়। বউ কথা কও, ফটিক জল, চোখ গেল, পিউ কঁাহা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত তো চোখের সামনেই রয়েছে। তাছাড়া হুতুমের 'হুম্', পায়রার 'বক-বকম্', 'শেয়ালের 'ক্যা হুয়া' এসবও আছে। নৈসর্গিক ধ্বনিকেও আমরা নিজেদের মতো করে প্রকাশ করি—বাতাসের 'হাহা' 'হুহু', বজ্রের 'কড়মড়', স্রোতের 'তরতর'—এগুলো একই সঙ্গে ধ্বন্যুক্তি ও অর্থবহ।

যা বলছিলাম। অবনীন্দ্রনাথের খেয়ালি কল্পনায় এসব শব্দবৈচিত্র্য আরো বহুগুণিত হয়েছে। এদের সাহায্যে তিনি অনেক সময় রীতিমতো রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাহাড়ে বনে রাত-জাগা পাখির নানা রকমের ডাক যাঁরা শুনেছেন, গভীর রাতে বন্যপশুদের আনাগোনার শব্দ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন এই বর্ণনাটা কত জীবন্ত : রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে—

> পাহাড়ে এক পাখি ডাকলে "হুহু বাতাস হুহু", ও পাহাড়ের পাখি তার প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল—"ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।" দুই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে, "জল পিটপিট তারা মিটমিট"। বোঝা গেল এখনো বিষ্টি পড়ছে, দুয়েকটি তারা কেবল দেখা দিয়েছে।

আবার সেইসঙ্গে বন্যজন্তুরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে—

> ভালুক-ভালুকী ঝরনার পথে জল খেতে নেমেছে···বলাবলি করছে শোনা যাচ্ছে—"সেঁৎ-সেঁৎ।" একটা হরিণ কিংবা কি বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল—"পিছল্!" তার পরেই একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। —বুড়ো আংলা পৃ ১০৮

অন্ধকার রাতে পাহাড়-দেশের গা-ছমছম-করা অদৃশ্য দৃশ্যপট শুধুমাত্র শব্দশ্রুতির ক্যামেরাতেই যতটা সম্ভব দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠেছে। এখানে "হুহু বাতাস হুহু" কিংবা "ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট" রাত-জাগা জংলি পাখির ডাকের ছন্দটাকে ধ'রেই একটা অর্থবহ ভাষা পেয়েছে। "জল পিটপিট তারা মিটমিট"-ও তাই।

ভালুক-ভালুকীর "সেঁৎ-সেঁৎ" শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে ঝরনার পথটা স্যাঁৎসেতে; সেই সঙ্গে আরো-একটা প্রাণীর "পিছল্" কথাটাও বৃষ্টিভেজা পাহাড়ের পিচ্ছিল খাড়াইয়ের ইঙ্গিত করছে, একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ার শব্দে সে-ছবি আরো স্পষ্ট হল।

অবনীন্দ্রনাথ কৌতুক ক'রে বলেছেন, পশুপাখির কথাবার্তার মর্ম বুঝতে পারা যার-তার কাজ নয়। এ হল 'শকুন-বিদ্যে'। 'সিকস্তি পয়স্তি কথা'য় খুদিরামের মুখে মোরগের উক্তি'র ব্যাখ্যা শুনে খাজাঞ্চি মশায় বলছেন—

> দেখতে পাচ্ছি তোমার পেটে…শকুন-বিদ্যে রয়েছে। জগতে এ বিদ্যে অতি কম লোকেই পায়।…এদেশে এক অবনীবাবুতে আর তোমাতে এই বিদ্যে অর্শেছে দেখছি। খবরদার…এ বিদ্যের কথা কাউকে জানতে দিও না। —রং-বেরং, পৃ ৪৭

খুদিরামের কথা জানি নে, তবে 'অবনীবাবু'র এ বিদ্যের কথা দেশময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। আমরা অবাক হয়ে শুনি, তাঁর বুদিগাই বলে—ওমা ওমা,[৩] ওমঃ মাগো,[৪] কে গাঃ কে,[৫] বুনো রামছাগল বলে—এ্যাঃ,[৬] সে তার ইস্কুলের প'ড়োদের পড়ায়—ক, খ, গ, ঐ, ব্যে, স্হে,[৭] বোকা ছাগলের দল জাতীয় সংগীত গায়—চোঁ ভোঁ পেঁ পোঁ[৮]। দুম্বা বলে—ব্যোঘাৎ ব্যোঘাৎ[৯]; হুদুদুম্বা বলে— …ওম ওম্বা •; আর "ভেড়ার পাল 'কুরবী কুরবী' ব'লে এ ওর মুখে তাকায়।"[১১] এদিকে বেরাল পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—কেঁও মিয়াঁ[১২]; ভোঁদড় প্রশ্ন করে—কো-ও-থায়[১৩]; কুকুর গরগর ক'রে বলে—কেঁও[১৪], রও-ও-ও[১৫]। একদল শেয়াল পেট চাপড়ে বলে—খাওয়া হুয়া খাওয়া হুয়া[১৬], আর-একদল বুক চাপড়ে বলে—হত্যা হুয়া হত্যা হুয়া[১৭]। বানর অনেকটা মানুষের মতো, তাই তার ভাষাও খানিকটা মানুষ-ঘেঁষা, তবে অন্য রকম। কিচ্ কিচ্ ক'রে সে কথা কয়, খিটিমিটি তার মেজাজ, দাঁত কিড়্মিড়্ করা তার মুদ্রাদোষ, মুখ ভ্যাংচানো তার স্বভাব, আর দুপ্ দাপ্ লাফ-ঝাঁপ ছাড়া সে চলতেই পারে না। তার ভাষাতেও এই বিশেষত্বগুলো বর্তেছে। কিষ্কিন্ধ্যার বানরেরা বলছে—কিচিকিন্ধ্যা কিচিকিন্ধ্যা কিচিকিন্ধ্যা সহর…দন্ত খিটিমিটি লম্ফ ঝম্ফ[১৮]; আবার কেউ-কেউ বলছে—এক লাফ—এক হাত, দুই লাফ—দুই হাত; তিন লাফ চার লাফ, হুপ্ হাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্[১৯]।

পশুদের কথা আপাতত থাক। শোনা যাক কী বলে পাখিরা। তবে মনে রাখতে হবে, অবনীন্দ্রনাথের প্রাণিজগতে পাখির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, আর

এদের বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই। আগেই বলেছি 'বুড়ো আংলা' আর 'আলোর ফুলকি'র প্রায় সবটাই এরা দখল করে বসে আছে, এ-ছাড়া অন্য বইয়েও বিস্তার করেছে উপনিবেশ। এদের সকলকে এখানে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, তবে বিশেষ বিশেষ পাখিদের বাদ দেওয়াও চলে না। পরিচিত কাক-পেঁচা দিয়েই শুরু করি :

কাক কখনো শুধোয়—কই কই[২০], কখনো বলে—রও, রও[২১]; আদর করে বলে—খাও[২২], কখনো খবর জানতে চায়—কও কও কও[২৩]। আর পেঁচাদের কথা তো বলবারই নয় : দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা, পাহাড়ে সব পেঁচা হাসছে—হুঃ হুঃ, ঠিক ঠিক, বাঃ বাঃ, ঠিক ঠিক[২৪]; কুঁকড়োর বিরুদ্ধে তাদের ঘোঁটের সভা শুরু হতেই তারা সবাই মিলে 'এক-কাট্টা হয়ে' এক স্বরে গলার 'ঢাকযন্ত্র' পেটায়—হুতুম থুম, তুহুম তুম, লাগ লাগ ঘুঁট, লাগ লাগ ঘুঁট,·· দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো[২৫]। আবার শেষ রাতে কুঁকড়োর ডাক কানে আসতেই হুতুম বলে—গেলুম, ধুঁধুল বলে—মলুম : আর সব পেঁচা হুটপাট ক'রে পালাতে গিয়ে বলে—উঃ গেছি, উঃ গেছি[২৬]।

রকমারি পাখির ভিড় সবচেয়ে বেশি বুড়ো আংলায়। বালিহাঁস ডাকে —সেঙাত সেঙাত[২৭]; সুবচনীর খোঁড়া হাঁস শুধোয়—ক্যা ক্যা[২৮]; চকা নিকোবর শ্রান্ত হয়ে বলে—জিরোওবো, জিরোওবো[২৯]; মাছরাঙা সাড়া দেয়—জিরোও, জিরোও[৩০]। রিদয়কে 'হংসপাল' ক'রে দেবার পর হাঁসেরা ফুকরে উঠল—হংপাল হংপাল[৩১]—ঠিক যেন মাঝরাতে আকাশপথে উড়ে-যাওয়া একঝাঁক বুনো হাঁসের ডাক; সঙ্গে-সঙ্গে বনের পাখিরা তার প্রতিধ্বনি ক'রে—হি-রি-দ-য় হংসপাল[৩২]—তাদের পাখা-ঝাড়ার ফর্‌ফর্‌ শব্দের সঙ্গে এক হয়ে 'হি-রি-দ-য়' কথাটা যেন ছত্রাকার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আবার নূতন পথে যাত্রা শুরু হবে, সেঁথো হাঁসেরা ডেকে উঠল—চকা নিকোবর চকা চকা চকা[৩৩]।

এ হল একটা দিকের একটুখানি আভাস। অন্যদিকে বনের ঘুঘু আদর করে বউয়ের ঘুম ভাঙাচ্ছে—বুবু ওঠো দেখি মুম্‌[৩৪]; বাস্তুঘুঘু তার দুঃখিনী বউকে সান্ত্বনার সুরে বলছে—বউ বউ দুঃখু পাওয়ার বউ[৩৫]; পাপিয়ার খবর শুধোতে গিয়ে কোকিল খানিকটা পাপিয়ার ভাষাতে বলছে—পিউ পিউ কিউ কিউ[৩৬]; আর বনের এক কোণে মানিনী বউকে একটিবার কথা কওয়াবার জন্যে বসন্ত-বাউরির সে কী সাধাসাধি—কথা কও বউ, কথা কও; মাথা খাও

বউ, কথা কও[৩৭]। ছা-পোষা শালিখের ধরন-ধারণ কিন্তু একেবারে আলাদা। গলার স্বর সরু-মোটায় ভাঙা হলেও তার এক-আধটু গানের শখ আছে, বাসার কাছে ব'সে গলা ছেড়ে গাইছে—সা রে গা মা, চারটি ডিমে তা[৩৮]; আর তার ছানারা ডালে বসে পড়া মুখস্থ করছে—গ্রীক্ ইট, ব্রীজ পুল, স্কুল ইস্কুল[৩৯]—যত সব দাঁত-ভাঙা শব্দ! একেবারে ছোটোরা পড়ছে—কীট্ কীট্ কিডিং[৪০]।

মোরগের কথা শুনতে হলে খুলতে হয় 'আলোর ফুলকি'। এটি মোরগের মহাকাব্য। তার নায়ক-কুঁকড়ো কত সুরে কত ছন্দে কত বিচিত্র কথাই যে বলেছেন বইখানিতে! ভোর-রাতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তিনি সবাইকে ডেকে বলেন—গা তোল্ তোল্[৪১]; একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করেন—ফজ্রী-ই-ইর্ ফ-জ্রীর্[৪২]; তারপর সুরু হয় তাঁর আসল কাজ: সূর্যকে ডেকে এনে সকালটিকে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তোলার সাধনা। তিনি সুর টেনে কখনো বলেন—আলো-ও-ও, কখনো আ-লো-র্ ফুল, আবার কখনো গানের মতো ক'রে বলেন—আলোর ফু-ল-কি-ই-ই[৪৩]। অমনি সূর্য ওঠে। কুঁকড়ো বলেন—খুলুক খুলুক[৪৪]—আর সকালের সোনালি রূপটি চারদিকে কেবল খুলে যেতে থাকে। একবার বাইরের দিকে, একবার নিজের দিকে তাকিয়ে কুঁকড়ো বলেন—ক্যা খপ্-সু-র-তি-ই-ই[৪৫]। কারো উপরে চটে গেলে কুঁকড়ো ধমক দিয়ে ওঠেন—ছুঁও মৎ, তফাত রও[৪৬], কিন্তু সুন্দরী 'সোনালিয়া বনের টিয়া'র প্রথম দর্শনে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে ওঠেন—একী! একে! কে এ![৪৭]

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে মুরগিদের কথাবার্তা আর পায়রা-মুরগির সংলাপ। 'আলোর ফুলকি'র প্রথম তিন পৃষ্ঠাতেই তা দেখতে পাচ্ছি। ঘড়ির মধ্যে পাখি সাড়া দিল—'পিয়া পিউ', অমনি সফেদি বলে উঠল—'ওই পাপিয়া ডাকল'; খাকি ছুটে এসে শুধোলে—'পাপিয়া লো কোন্ পাপিয়া? বনের না ঘরের?' উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদি সেদিকে 'রও' ব'লে দৌড়ে গেল। তাকে কী একটা বস্তু খুঁটতে দেখে অন্য সব মুরগি সাদিকে ঘিরে শুধোতে লাগল—'দেখি কী পেলি, দেখি কী খেলি, দেখি দেখি, কী কী।' সাদি টুপ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক করে হেসে বললে—'কট্ কট্ কলাট্—মা-স-ক-লা-ই'। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এ ছাড়া পায়রা ও মুরগির কথোপকথনটি পরম উপভোগ্য। মনে রাখতে হবে পায়রাও সব সময়ই কেবল 'বক-বকম্' করে না, এক-একসময় শোনা যায়

সে স্পষ্ট বলছে—'পাকপাথম—সেজদি…মেজদি…' (আপন কথা—পৃ ১৭)। কিন্তু যাক সে-কথা। আলোচ্য অংশে দেখছি, পায়রার সাধ হয়েছে কুঁকড়োর মাথার মোরগ-ফুলটি দেখতে। কিন্তু এতে চাই কুঁকড়োর বড়োবউ সাদির আনুকূল্য। তাই তার মন গলাতে সে মিষ্টি ক'রে ডাকে—'সাদি ও দিদি, ও সফেদি', কিন্তু এটাও যথেষ্ট হল না দেখে আরো মিষ্টি ক'রে ডাকে—'দুধি-ভাতি, সাদি, সাহাজাদী ও সফেদি'! এবার খুশি হয়ে সাদি সাড়া দেয়—'নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ, কী বলবে বলো।' মিনতির সুরে পায়রা বলে, 'একবারটি যদি দেখাও!' শুনে সাদির সঙ্গে সব মুরগিরই কৌতূহল জাগে, সবাই মিলে একসঙ্গে শুধোয়—'কী, কী, কী, কী দেখাব?' পায়রা ঢোঁক গিলে বলে—'তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটি'। যেই না কথাটি বলা, অমনি সব মুরগি এ-ওর গায়ে ঢ'লে প'ড়ে বলতে থাকে—'চায় লা, চায় লা, দেখতে চায়, দেখতে চায়।' এদিকে পায়রা তখন আলসের উপরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে—'দেখবই দেখব, দেখবই দেখব।' —আলোর ফুলকি পৃ ১-৩।

—ঠিক যেন অভিনয় দেখছি। অবনীন্দ্রনাথের সেই উদ্ধৃতিটি আবার মনে পড়ে—'ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন ক'রে ইঙ্গিত করতে করতে।' মুরগিদের মুখে মেয়েলি কথার ঢঙ কী সুন্দর ফুটেছে! 'নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ, কী বলবে বলো' কিংবা 'চায় লা, চায় লা, দেখতে চায়, দেখতে চায়'—কথাগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে 'ল'-এর অনুপ্রাস থেকে এসেছে তরল কণ্ঠের আভাস। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের গলা স্বভাবতই তরল, অনেকের গলা একেবারে কলকলানি। তাই খাবারের স্বাদ বর্ণনা করতে গিয়ে সুরকিকে বলতে শুনি—'যেন তেলাকুচোর তেলফুলুরি!'[৪৮] ওদিকে খাকিকে ঘুলঘুলির পাশে অনেকক্ষণ ধরে ঘুর-ঘুব করতে দেখে সাদি শুধোচ্ছে—'ওলো, ঘুলঘুলিটা খোলা পেলি কি?'[৪৯]

আর নয়। পাখিদের কথা একটু বেশিই বলা হল, কিন্তু উপায় ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের পাখিরা মানুষের বাড়া, তাদের স্বাধীন মতামত আছে। হতচ্ছাড়া একটা গ্রামের নাম মানুষ কোন্ যুক্তিতে রেখেছে 'ভদ্রপুর?' পাখিদের ভাষায় তার নাম 'নরককুণ্ড'। অত্যাচারী জমিদারের তেতলা বাড়ি 'অলকাপুরী'কে তারা বলে 'পোড়াবাড়ি'; মাতাল শিকারী জমিদারের 'লক্ষ্মীপুর' পরগণা তাদের কাছে 'মশালচুলি'; ভণ্ড বৈরাগীদের আড্ডা 'বৈরাগীপাড়া'-কে তারা

নাম দিয়েছে—'নিগিরিটিং'—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনীই সার। আবার ভালো জিনিসের 'ভালো'টাও তারা দেখতে জানে। ফল-ফসলে ভরা চমৎকার গ্রামটির নাম মানুষ রেখেছে 'খোলামুচি', পাখিরা তাকে বলে 'রাজভোগ'। আর সবচেয়ে বড়ো কথা—যা নিয়ে আমাদের এই আলোচনা—'ওবিন ঠাকুর ছবি লেখে' কথাটাও কিন্তু বুড়ো আংলার কুঁকড়োর মুখ থেকেই শোনা।

—বুড়ো আংলা, পৃ ৩২-৩৩।

৬

অবনীন্দ্র-সাহিত্যের একটা লক্ষণীয় অংশ জুড়ে নাচ-গানের আসর জমিয়েছে ছোটো-ছোটো কীটপতঙ্গের দল। আনুনাসিক ব্যঞ্জনধ্বনি-সমাকীর্ণ তাদের ভাষা বিশেষ কৌতুকাবহ। এদের ধ্বনিবৈচিত্র্যকে ধরবার জন্যে তাঁকে নিতে হয়েছে সূক্ষ্মশ্রুতির সহায়তা, যার ফলে তাঁর নিজের ভাষাও পেয়েছে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ক্রমে তা প্রসারিত হয়েছে আরো বহু ক্ষেত্রে। যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব।

কীটপতঙ্গের অনেকগুলি শব্দই তাদের ছোটো-ছোটো পাখার ঘর্ষণসঞ্জাত, যা শুনতে খানিকটা তার-ঝংকারের মতো। একে নিয়ন্ত্রিত করছে একটা উচ্চারিত ছন্দস্পন্দন। এই ধ্বনিপ্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে মানুষের ভাষায় তার ধ্বনিপ্রতিরূপ সৃষ্টি করা সহজ কাজ নয়। এটা যে করতে পারে তার থাকা চাই অতি সূক্ষ্ম কান আর অসামান্য কল্পনাশক্তি। আলোচনার গোড়ার দিকে আমরা অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টিচেতনার কথা বিশেষভাবে বলেছি। বস্তুত শিশুকাল থেকে তাঁর চোখ কান দুটিই ছিল পূর্ণমাত্রায় সজাগ। এদের মধ্যে দিয়ে বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন মগ্ন হত রূপের ধ্যানে। ছেলেবেলায় তাঁর 'শব্দ-শোনার কান' কত প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই আমরা তা জানতে পারি—

> সুতোর সঞ্চারে পৌঁছত এসে আকাশের দিক থেকে চিলের ডাক। বাতাসের ডাক খুব মিহি সুর দিয়ে কানে আসত—ঝড়ের একটা আবছায়া মনে পড়ত—একটা দুটো কোমল টান প্রথমে, তারপরে খানিক চড়া সুর, তারপর বেশ একটা ফাঁক, তার ঠিক পরেই একটা তীব্র সুর বাতাসের।

—আপন কথা, পৃ ৫২

এ হল নিছক শ্রুতিচেতনার কথা। তবু এর মধ্যেও 'সুতোর সঞ্চারে' ভেসে-আসা দূর-আকাশের চিলের ডাক সুরের একটি সূক্ষ্ম রেখা টেনে দিত তাঁর মনে, আর বাতাসের শব্দের নানারকম ওঠা-পড়া থেকে 'ঝড়ের একটা আবছায়া' যেন মূর্তি ধ'রে দেখা দিত তাঁর সামনে। এ ছাড়া কানে-শোনা 'গল্পকথা'র কত ছবিই তো এসে ভিড় করত তাঁর চারদিকে—

> যখন চোখও চলে না বেশি দূর, পা-ও হাঁটে না আনকখানি, তখন কান ছিল সহায়। সে এনে পৌঁছে দিত কাছে ছাত, হাঁতে এনে দিত কমলাফুলির টিয়ে পাখি, চড়িয়ে দিত আগডুম বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পালকিতে, এবং নিয়ে যেত মাসি-পিসির বনের ধারের ঘরটিতে আর আমার মামার বাড়ির দুয়োরেও।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫০

এই সূক্ষ্ম শ্রুতিচেতনা ও জীবন্ত রূপকল্পনার সাহায্যেই কীট-পতঙ্গের শব্দস্পন্দনকে তাদের চরিত্রলক্ষণযুক্ত ভাষা দিতে পেয়েছিলেন তিনি।

এখানে অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিলোকের সবরকম কীটপতঙ্গের কথাবার্তা, নৃত্যগীত ও বাদ্যিবাজনার বৈচিত্র্য উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :

'আলোর ফুলকি'তে শুনতে পাচ্ছি 'বোলতারা সব ফলন্ত গাছকে ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে, সোনার ফলের গান, হুল রাগে—'

> মন ভুলে গুঞ্জরি···মুঞ্জরি মুঞ্জরি ··
>
> ফুলের মঞ্জরি! আমরা গুঞ্জরি ·· পৃ ৫৬

তারপর মৌমাছিরা গাইতে লাগল দলে দলে 'মধু'র গান—'

> আলোতে চলি সবাই গুন্‌গুনিয়ে
>
> আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে
>
> গুন্‌গুনিয়ে···পৃ ৫৭

ওদিকে তার আগে শুরু হয়ে গেছে ফড়িংয়ের 'স্ট্রীং ব্যাণ্ড'। কিন্তু থাক্ সে-কথা। এদিকে দেখছি কীটপতঙ্গের আসর ভালোই জমেছে ভূতপত্‌রীর যাত্রায় : উইচিংড়ি নেচে নেচে গাইছে—

> ছি ছি ছি চি
>
> গিচি গিচি
>
> তেঁতুলে বিছে দিলে খিমচে···

রী-রী…রী-রি ছিঃ

—কিশোর সঞ্চয়ন পৃ ৮৯

আবার মশামাছির সঙ্গে ব্যাঙ-ব্যাঙাচিও মেতে উঠেছে—

ভন্‌ভনানি মশামাচির
গপ্‌গপানি ব্যাঙ-ব্যাঙাচির…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮৯

অবশ্য নেহাত যাত্রার আসর বলে মশা এখানে ভালোমানুষটির মতো কেবল 'ভন্‌ভন্'-গুঞ্জনের সুর সাধছে, নইলে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে তারা মশারির চারদিক ঘিরে দল বেঁধে দাবি জানায়—'টাকাং দিং, টাকাং দিং' (পৃ ৬)। যাক, ফিরে আসি যাত্রায়। আসরে এবার নাচ জুড়ে দিয়েছে গঙ্গাফড়িং—

গঙ্গাফড়িং গঙ্গাফড়িং
পোষ্কা নাচে তিড়িং বিড়িং…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮৯

এদিকে কাঁচপোকাও তার ঝাঁঝ নিয়ে এসে হাজির—

ঝাঁঝ বাজে কাঁচপোকার
ঝিমি ঝিমি ঘুমপাড়ানি…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯০

কিন্তু সবার উপর টেক্কা দিয়েছে ঝিঁঝিপোকা। সমস্ত রাত ধ'রেই তারা গান-বাজনায় মত্ত। তাদের বাদ্যি-বাজনার কত রকমারি ঢঙ! আসরের একেবারে সূচনায় শোনা যায়—

ঝিঁঝার ঝিনিক্ রিনিক্ ঝিনিক্
ঝির্‌ঝির্ ঝিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ ঝিন্‌ঝার
চিড়িক্ চিড়িক্ চিক্—চিক্কুর…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯১

আবার তাদের 'জিঞ্জির নৃত্যে' শুনি—

মঞ্জির জিঞ্জির খুঞ্জরি টিংটিং
রিপিটিং রিপিটিং ক্রিংইং ক্লিংইং…

এবং এর শেষের দিকে বাজতে থাকে—

গীটার ষ্ট্রীং স্ত্রীং স্ত্রীং
ক্লিয়ার ট্রাস রোলিং রোলিং

ফ্লোর সিলিং
ক্লীন্ কপ্ বস্ স্টপ্।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯০

কিন্তু একেও ছাড়িয়ে যায় তাদের উচ্চনাদী ঐকতান—

ঝাং কিটি কিটি ঝাং
হিজি বিজি গিজি গিজি
ঝাং ঝাং ঝাং ঝাং
ঝাঝাং ঝাং গজাং গজাং
ঝাঁই কিড়ি ঝাং…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯১

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাকের ধ্বনিসাদৃশ্যে শুধু কতকগুলি অনুকারশব্দই নয়, সেই সঙ্গে এমন-সব শব্দও এসে পড়েছে যেগুলো অন্যভাবে আমাদের কাছে পরিচিত, যেমন—মঞ্জির, জিঞ্জির, হিজিবিজি, স্প্রীং, রিপিটিং, গীটার স্ট্রাং ইত্যাদি। কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না। ঝিঁঝিরা বলবে, এসব শব্দের ধ্বনিগুলি একান্তভাবেই তাদের। এগুলো ধার ক'রে নিয়ে মানুষ কী অর্থে এদের ব্যবহার করেছে, সে তারা জানতেও চায় না। বস্তুত এই বিচিত্র শব্দঝংকারের সমবায়ে ঝিঁঝির ডাকের এমন একটা জম-জমাট পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে তাদের লাফ-ঝাঁপ-ফুর্তি-আমোদের সামগ্রিক চেহারাটাও চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর সবটাই ঘটছে ধ্বনিব্যঞ্জনার তির্যক ইঙ্গিতে।

৭

এই শেষ কথাটার উপরে এবার বিশেষভাবে জোর দিতে চাই। কেননা শব্দধ্বনির তির্যক ইঙ্গিতের পথ ধ'রে পতঙ্গ-জগতের গণ্ডি পেরিয়ে এবার আমরা অবনীন্দ্রনাথের আরো-এক বৃহৎ বিচিত্র সৃষ্টিলোকের দ্বারে এসে পৌঁছেছি। এই ইঙ্গিত এখানে আরো সক্রিয় হয়ে বর্ণিত বিষয়কে চরমভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে; বাচ্যার্থের অপেক্ষা না ক'রে কথার ধ্বনিপ্রকৃতি থেকেই যেন ফুটে উঠেছে রূপ, ঘটে যাচ্ছে ঘটনা। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথমেই মনে আসছে কতকগুলো ঘোড়ার মূর্তি—

আগারোম্ বাগারোম্ সবরোন্ ঘোড়া
নর্মন্ ঘোড়া জর্মন্ ঘোড়া
আগাডুম বাগাডুম ··পান্টুন ঘোড়া
ঢাক্‌টুম্ টাকাটুম্ বর্মন টাট্টু
টপাটপ্ টপাটপ্ স্টড্‌ব্রেড ঘোড়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০০

দেখতে পাচ্ছি এরা সব স্বাস্থ্যবান ঘোড়া, এদের বেশির ভাগই বড়ো আকারের। এদের খুরের শব্দে আর গতির ছন্দে একটা আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এদের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক আরো কতকগুলো ঘোড়াকে—

চক্কর ঘোড়া লক্কড় ঘোড়া···
তড়বড় তড়বড় টাপে টাপে টক্কর লাগ্···
খট্ খটাখট্···চট্ চটাপট্···
তত্বড় তত্বড় ছক্কড় লক্কড় লড় বড় লড় বড়···

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০১

এদের পা ফেলার তাল যতই দ্রুত হোক, খুরের শব্দ বলছে এরা অভিজাত নয় এবং আকারে বেঁটে-খাটো। আগের ঘোড়াদের তুলনায় এরা দুর্বল, এদের কোনো-কোনোটাকে হয়তো ছ্যাকরা-গাড়িতে জুড়ে দেওয়া যায়। এদের চেয়ে ঢের বেশি তেজীয়ান—

টাক টুমাটুম টাক টুমাটুম টাট্টু ঘোড়া
লাট্টু রামের টাট্টু ঘোড়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০৪

ঘোড়ার ছবির সঙ্গে আরো একটা ছবি মনে আসছে সেটা চলন্ত ট্রেনের। এখানে একটা কথা বলে নিতে চাই। চলন্ত ট্রেনের প্রতি সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথেব একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই কখনো বর্ণনার ভাষায়, কখনো অনুকার শব্দের ইঙ্গিতে তিনি একে বিচিত্রভাবে তাঁর লেখায় ধ'রে রেখেছেন। তাঁর—

> রেল একটা ঝরনা থেকে হোঁস-ফোঁস করে খানিক জল ইঞ্জিনে ভরে নিয়ে ঘুম জোড়বাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভক ভক করে বকতে বকতে—

—বুড়ো আংলা পৃ ৮১

কিংবা—

অন্ধকারের মাঝখানে একটা তীব্র বাঁশি দিগন্তের সুনীল পরিসর হঠাৎ ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে উঠল! আবার আলো, আবার ধুলো, আবার কোলাহল! এ সমস্তকে ছাড়িয়ে যখন পৃথিবীজোড়া প্রকাণ্ড রাত্রি ভেদ করে চলেছি তখন কেবল শুনছি পায়ের তলা দিয়ে একটা ঝন্‌ঝনা লৌহ-নির্ঝরের মতো ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।

—পথে বিপথে পৃ ১১৩

এ-ধরনের ছবিতে দৃষ্টি ও শ্রুতি-চেতনার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এখন আমরা যে-ছবির আলোচনা করতে যাচ্ছি তাতে শুধুমাত্র শ্রুতিচেতনার মধ্যে দিয়েই চারটি চলন্ত ট্রেনের চার রকম গতিরূপকে ধ'রে রাখা হয়েছে। প্রথমে 'তুফান মেল' : সে অভিজাত ট্রেন, আসছে রাজধানী দিল্লি থেকে। মেজাজ শরিফ থাকলে সে ইংরেজি কবিতা আওড়ায়, শ্রান্তি এলে ঈষৎ হাঁপায়, আবার নিজের মধ্যে থেকেই বল সঞ্চয় করে; কিন্তু দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তার মেজাজ চড়ে যায় সপ্তমে, ধমক ঝাড়তে থাকে কড়া ইংরেজিতে—

প্রথমে খোশমেজাজ—

টুইঙ্কল্ টুইঙ্কল্ লিটিল্‌স্টার···

এরপর একটু শ্রান্তি—

আফ্‌তে বাফ্‌তে আফ্‌তে বাফ্‌তে···

আবার খানিকটা উৎসাহের সঞ্চার—

খাস্ গেলাস্ খাস্ গেলাস্ ··

এবার মেজাজ তিরিক্কি—

গেটাউট্ গেটাউট্ গেটাউট্···

—একে তিন তিনে এক পৃ ২

'মাদ্রাজ মেল' অবশ্য এ রকম নয়। তার চাল চলন দুই-ই আলাদা। সে চলে গড়িয়ে গড়িয়ে, তার ভাষায় খানিকটা দক্ষিণভারতীয় টান—

বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু
বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু
গড়ুদারুলু গড়ুদারুলু···

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২

আর 'স্বদেশী রেল-কোম্পানীর ট্রেন' হল একেবারে খাঁটি হাওড়া-আমতা-

মার্কা। তার না আছে গোত্রগৌরব না আছে শক্তিসামর্থ্য। সে চলতে চলতে থামে, থামতে থামতে চলে। যখন তখন তার দম যায় ফুরিয়ে। সে বলে—

গাবগুবাগুব গাবুর গুবুর
গব্ গব্ গব্
আমতা, জামতা, ঘুঘু-মেতি স্থঃ—

বলেই যেন সে 'ভিজে মাটিতে ছুঁচোবাজির মতো ফুস্ করেই নিবল।'

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২

'ঢাকা স্পেশাল' কিন্তু একেবারেই তা নয়। তার 'ঘরানা' বনেদি ঘরের, তার কৌলীন্য নবাবীসূত্রে পাওয়া। সে চলে চোস্ত উর্দু-ফার্সি 'বয়েত' আউড়িয়ে দমকে দমকে—

গজল্ ফজল্ গজল্ ফজল্
তেরে কিটি তাক্
খাস্তা খাস্তা···বোরখা বোরখা
সিয়াকলম্ সিয়াকলম্

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে এ রকম ধ্বন্যাত্মক চিত্র-রূপায়ণের বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এবারে ঘটনা-রূপায়ণে ইঙ্গিতময় শব্দধ্বনির ক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাক।

৮

দৃশ্যরূপের মতো ঘটনাপুঞ্জকেও অবনীন্দ্রনাথ অনেক সময় চিত্রিত করেছেন বাক্-ধ্বনির রূপানুষঙ্গে। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে ঘটনাকে মুখ্যত শব্দধ্বনির ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা,—বাক্যের অসংলগ্নতা, শব্দের অশুদ্ধি, পদান্বয়ের ত্রুটি—এসব মোটেই ধর্তব্য নয়। ধরা যাক একটা দৃষ্টান্ত: কোথায় কী একটা বস্তু হঠাৎ শব্দ ক'রে পড়েছে। হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সামান্য ঘটনাটিকে শব্দধ্বনির বিচিত্র ব্যঞ্জনায় অবনীন্দ্রনাথ অসামান্য ক'রে দেখিয়েছেন, এবং একে নিয়ে অনেকগুলি কৌতুক-চিত্র এঁকেছেন। তার থেকে মাত্র দুটির উল্লেখ করছি। গাছ থেকে চালতা পাড়তে গিয়ে অবুনাথ 'চিৎপাৎ পপাৎ ভুপাৎ।' অমনি চারদিকে সাড়া পড়ে গেল—

কিপ্লোলো? কিপ্লোলো?
গাছে চেপে কেপ্লোলো…
দ্রুম ধদ্ধড় শব্দ হল
শব্দকল্পদ্রুম পোলো
দ্রুম্পোলো দ্রুম্পোলো…

—কিশোর সঞ্চয়ন পৃ ৯৩

এমনি করে কখনো মাসির ঘরের 'খিল' পড়ে, কখনো আকাশ থেকে 'চিল' পড়ে, আবার কখনো খসে পড়ে, সাক্ষাৎ 'যমদণ্ড !'—

দ্রম্ দদ্দড় ধ্রম্ ধদ্ধড়
কিপ্‌পোলো কিপ্‌পোলো
যমজয়ন্তীর তোপ্‌পোলো
যমদণ্ড ভঙ্গ হোলো
দশ খণ্ড হোলো,
কাল দণ্ড ফাল হোলো,
ফাল্লোলো।

—চাঁইবুড়োর পুঁথি পৃ ৬২

যাই এবার অন্য ঘটনায়। কিষ্কিন্ধ্যার বানরেরা আনন্দে নৃত্য করছে— 'নৃত্য ধি ধি কিটি ধি ধি ধিন্‌তা।' এমন সময় রাবণের 'যুদ্ধং দেহি' হুংকার শুনেই—

'বানরদের লাঙ্গুল শিহরিত। দন্ত ক'টা কিড়িমিড়ি ক'রে বলছে—'

অ রি রী রী রাবণ দুরাচার
ইমন বচন মুহে না আনিও আর
রে রে রী রী রি রি…

কিন্তু রাবণের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন? তাদের একটাকে 'মুখে পুরে রাবণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই' অন্য-সবাই পালাবার পথ পাচ্ছে না—

উপ্ আপ্ ওরে বাপ্…
ঝুপে ঝাপে ঝুপ্ ঝাপ্ গুপ্ গাপ্…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩৬-৩৭

কিন্তু রাবণকেও এক-একসময় বিপাকে পড়তে হয়। যজ্ঞের চরু খেয়ে শূর্পণখার গলা তৃষ্ণায় কাঠ। রাবণ প্রস্তাব করলে সে শূর্পণখাকে পাতালে

নিয়ে গিয়ে ভোগবতীর জল খাইয়ে আনবে। তারপর কী করে 'ভাইবোন পাতালে নামলে?'—

অম্বুকী বিম্বুকী ব্যাং
মেলে যেন ঠ্যাং
ঝপাং পড়ল কুয়ো তলে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৩

'অম্বুকী বিম্বুকী' কী ধরনের ব্যাঙ জানিনে, তবে তারা যে ব্যাঙ—এটাই যথেষ্ট। উপর থেকে রাবণ ও শূর্পণখার অসহায়ভাবে হাত-পা ছেড়ে কুয়োর তলায় খসে পড়ার কৌতুকদৃশ্যটি আঁকবার জন্যে এখানে 'ব্যাং' 'ঠ্যাং' আর 'ঝপাং' এই তিনটি অনুস্বারযুক্ত শব্দের একান্ত প্রয়োজন।

চোখে ভাসছে আরো একটা ঘটনা। একেবারে অন্য রকমের। লাফিয়ে ঠ্যাং খোঁড়া হল শেয়ালের, তবু সে পেলে না আঙুরের নাগাল। শেষটা 'থ্যাঙ্ক্য়ু' বলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তার প্রস্থান—

…আঙ্কু বাঙ্কু ঠ্যাংউ ঠাঙ্কু—
লেংচু লেংচু ল্যাজ গুড়াঙ্কু…
ল্যাজ গুড়াঙ্কু ঠ্যাংউ ঠাঙ্কু
থেঙ্কু থেঙ্কু।

—লম্বকর্ণ পালা পৃ ৮৩

ওদিকে 'রং-বেরং'-এ ততক্ষণে শুরু হয়েছে আর এক কাণ্ড—লড়াই লাগ্ লাগ্! উড়ে মালী কুড়ের বাদশার দুই সর্দারকে নিয়ে ছুটল লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে—

চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি
আগাবাড়ি সাঁইকিড়ি
ধাইকিড়ি আইকিড়ি
ডিঙামাটি ঝিঙাবাড়ি
ঝাঁইকিড়ি ঝনকিড়ি—

সঙ্গে-সঙ্গে লড়াই বেধে গেল রণ্ রণ্ শব্দে—

ঝম্-ঝমা-ঝম্ ঝিম্কিড়ি!

—রং-বেরং পৃ ১২০

আবার কথা কী ?

এ ছাড়া নৈসর্গিক ঘটনা চিত্রণে ধ্বন্যুক্তির প্রয়োগে অবনীন্দ্রনাথ তো একেবারে সিদ্ধহস্ত। তাঁর রচনার অসংখ্য স্থানে এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। কত আর উদ্ধৃত করা যায় ?—'শিল পড়ে তড়বড় / ঝড় বহে ঝড়ঝড়'[৫০] ; কিংবা 'তড়বড়ি শিলার, জলের তরতরি / ঘুট্‌ঘুটে আঁধার, বজ্রের কড়মড়ি'[৫১] ; অথবা 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর / বাজছে মাদল গামুর গুমুর'[৫২]—এসব তো আছেই তাছাড়া মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, ঝড় সব একসঙ্গে মিলেছে, এরকম দৃষ্টান্তও রয়েছে—

মেঘ হাঁকে, "গড় কর্, গড় কর্, গড় কর্।"
বিষ্টি বলে, "টুপ টাপ, চুপ চাপ, ঝুপ ঝাপ।"
শিল বলে, "তড়বড়, গড় কর্, গড় কর্।
লাফ দিয়ে ঝড় এলো
ঘাড় ধরে বলে গেল—
"গড় কর্, গড় কর্।"
—আলোর ফুলকি পৃ ৮৪

আবার সামুদ্রিক ঝড়ও বাদ পড়ে নি—

বায়ু কোণে ঐ শুন ভেঁপু বাজায় টাইফুং
হারিকেন ঈশান কোণে
বিশাল বাজান বুম্ বুম্ বুবুং বুং
—মারুতি পুঁথি পৃ ৮৯

আপাতত এই যথেষ্ট, এবার একটুখানি থামতে চাই।

৯

অবাক লাগে ভাবতে, শব্দধ্বনির ব্যঞ্জনাকে কী দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ? বাক্যে 'গুরুচণ্ডালি'র প্রশ্ন নেই, রীতি-বিপর্যয়ের প্রশ্ন নেই, এমন কি ভাষা-সংকরেরও প্রশ্ন নেই—বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরী, হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত, ফার্সি, ইংরেজি—সব ভাষার বিকৃত-অবিকৃত, ভুল-শুদ্ধ সবরকম শব্দেরই প্রয়োজন তাঁর। একমাত্র লক্ষ্য, রূপ ফুটিয়ে তোলা—তা সে শব্দার্থের সরল ইঙ্গিতেই হোক, আর শব্দধ্বনির তির্যক ব্যঞ্জনাতেই হোক। ছবি চাই দৃশ্যের, ঘটনার—বাস্তব অবাস্তব সব কিছুর। ছবি চাই চরিত্রের : মানুষ, পশুপাখি, ভূতপ্রেত, ঠাকুর-দেবতা, রাক্ষস-খোক্কস—যারই হোক।

ভাষা-সংস্কারমুক্ত অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক-চরিত্রগুলি তাই এত জীবন্ত। ওড়িয়া গায়েনের ছবি আঁকতে হবে? তার মুখে বসিয়ে দিলেন—মধু মাসরে গুবাকু ফুকি[৫৩]; ভোজপুরী ভিস্তি আঁকতে হবে? তার মুখে শোনা গেল—শীতল শীতল পানি ছিটল[৫৪]; কাবুলি মেওয়াওয়ালা আঁকতে হবে? তার মুখ থেকে বেরোতে লাগল—আঙুর পেস্তা খিস্‌মিস্ বাদাম্[৫৫]; হিন্দী গানের ঝোঁক চেপেছে রিদয়ের? অমনি সে গাইতে লাগল—চহুঁয়ার ঘেরলিয়া ফোজ কি গিতাপয়া[৫৬]; হারুন্দেকে বোগদাদের বাদসাহের মেজাজ দেখাতে হবে? অমনি সে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়ে হয়ে গেল—'হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা,—'মস্থর'-কে নিয়ে 'পারস্য গালিচা'য় চেপে শূন্য পথে উড়ে যেতে দূরে চেয়ে দেখলে 'ফিরিঙ্গি মুলুক' আর 'রুমের বাদশার কনস্তনতুনিয়ার কেল্লা[৫৭]; সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখাতে হবে? শুরু হয়ে গেল—লেফট রাইট অফ্ লাইট/ম্যাড্রাস ব্যাণ্ড স্লাইট স্লাইট[৫৮]। কুম্ভীনসী হরণের সংবাদে ক্রুদ্ধ রাবণের কৌতুকাবহ মূর্তিটি ফোটাতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রাবণের মুখে দিয়েছেন হিন্দী-বাংলা-মেশানো হাস্যকর মিশ্র ভাষা। কুম্ভীনসী চুরি যাওয়ার কথাটা ভিন্দিপাল 'কিছু কিছু' শুনেছে বলতেই রাবণ তার উপরে চটে অগ্নিশর্মা—কেবল নকড়া ঝকড়া ভুঁজা আর ভুরা। কুম্ভীনসী গিয়া চুর, বোলতা কি না কুচ্‌কুচ্[৫৯]।—কিছুই বলবার নেই, শুধু শুনতে হবে আর দেখতে হবে।

কৌতুক-চরিত্র চিত্রণে অবনীন্দ্রনাথকে অনেক সময়ে সাহায্য করেছে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিঝংকার। তবে সে ভাষা বিশুদ্ধ হবে কিংবা অবিমিশ্র হবে, এমন কোনো কথা নেই। তিনি চান ভাষার ধ্বনিপ্রতিরূপ। শব্দ যা-ই উচ্চারিত হোক, সংস্কৃতের মতো শোনালেই হল। আমাদের লৌকিক ভাষাতেও এমন অনেক শব্দ আছে যা শুনতে সংস্কৃতের মতো। যেমন, উঃ, আঃ, বাঃ, হুম্ হুম্, দুম্, দুম্, ছটফট ইত্যাদি। তাছাড়া অনুস্বার যোগ করলে যে-কোনো বাংলা শব্দের এমন রূপান্তর ঘটে যে একেবারে 'হিং টিং ছট্।' এসব শব্দকে সংস্কৃত বলে চালিয়ে দিতে অবনীন্দ্রনাথের কোনোই আপত্তি নেই। তা নইলে ছেলে বুড়ো সকলের জন্যে লেখা তাঁর সৃষ্টিছাড়া কৌতুক-কাহিনীর অনেকগুলি অদ্ভুত চরিত্রের কী দশা হত? এদের সংখ্যা তো একেবারে কম নয়! যা হোক দু'চারটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

হেড়ম্ব-গণেশ রিদয়ের কথার জবাব দিলেন দেবভাষায়—"বুং।"...তারপর

ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে এদিক-এদিক শুঁড় নেড়ে কী বললেন বোঝা গেল না। রিদয় শুধু শুনলে—

বুং চটাপটং ত্বং কং করং বাদনং পুনস্তম্
ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম্…

রিদয় বুঝতে পারলে গণেশ প্রসন্ন হয়েছেন। অমনি নিজের কল্পনা থেকে স্তব পাঠ করতে লাগল—

হুং ভূত স্বাহা কুরু কুরু কুণ্ডলিনী নমো…
হং যং ছট্ ফট্ · হুং শান্তি, ভূশান্তিং,
ভূ্যতরশান্তি…

—বুড়ো আংলা পৃ ১৫৭-১৫৮

স্বয়ং চাঁইবুড়ো মারুতির পুঁথি পাঠের আরম্ভে গণেশ ও হনুমান বন্দনা করছেন—

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং…

—মারুতির পুঁথি পৃ ১

বৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষ দাঁত পড়ে ফোকলা হয়েছেন। তাঁর মুখে কার্তবীর্যার্জুনের ধ্যানটা শোনা গেল এই রকম—

নর্মদা তীরে কাষ্ঠ বিগ্যার ঘুণ রাজা ছন্দ্রবংশে
স-স-সহচ্ছ বাহু তাজ বিষ্ণু অংশে…

—চাঁইবুড়োর পুঁথি পৃ ৩০

ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী—এদের তাড়াবার জন্যেও আছে সংস্কৃত মন্ত্র। হাড়গিলে পেঁচো তাড়াবার মন্ত্র ঝাড়ছে—

…ক্লীং চর্চ হুং হুং ঝংসা…হুং ফট্ স্বাহা

এদিকে রিদয়ও সঙ্গে সঙ্গে 'ভূতের মন্তর' আওড়াচ্ছে—

হং অং বং লং হাঃ ফুঃ!

—বুড়ো আংলা পৃ ১৫৮/১৫১

যাক। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে, এইসব অদ্ভুত মন্ত্রধ্বনির সাহায্য না নিলে এ-ধরণের উদ্ভট চরিত্র কিছুতেই এমন জ্যান্ত হয়ে উঠত না।

কৌতুক-চিত্র কিংবা কৌতুক-চরিত্র আঁকতে গিয়ে অনেক সময় ভাষায় 'গুরুচণ্ডালি'র আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে: কুস্তিগীর অবতার[৬০], কাষ্ঠবিড়াল[৬১] খ্যাঁকশৃগাল[৬২]; ঘৃতের খাঁকড়ি[৬৩], কর্ম ফরসা[৬৪], ব্রহ্মরন্ধ্র তক্[৬৫]—এ ধরনের কথা ঠিক ঠিক জায়গায় এমন নিপুণভাবে বসানো হয়েছে যে কী

বলব! আবার বিশেষ বিশেষ চরিত্র-চিত্রণে শব্দবিকৃতিরও একটা রস-রূপায়ণিক তাৎপর্য আছে। প্রাকৃতজনের চরিত্র আঁকতে হলে লোকজীবন থেকেই এর উপাদান সংগ্রহ করতে হয়—সাধারণ লোকের বিকৃত উচ্চারণরীতিও এক্ষেত্রেই একটা বড়ো সহায়। স্যাঁৎসেতে বাদলা দিনটা 'ছিরিপদ, ছিরিকণ্ঠ আর ছিরি অভিলাষে'র কাছে 'ভারি বিতিকিচ্ছিরি'[৬৬] ঠেকবে—এতে আর আশ্চর্য কী? তাই অবনীন্দ্রনাথের লেখায়—বুড়োরং[৬৭], চিত্তিরগুপ্ত[৬৮], ছেরেদ্দা[৬৯], ভিরকুট্টি[৭০], চিচ্‌কার[৭১]; কিংবা বেসলেট[৭২], এসেন-সাবান[৭৩], ফাস-কেলাস[৭৪]—প্রভৃতি শব্দ যেসব জায়গায় বসেছে সেখান থেকে কার সাধ্য তাদের নড়ায়। আবার ঐ একই কারণে এক ধরণের চরিত্র-চিত্রণে আঞ্চলিক গ্রাম্য শব্দ, প্রাচীন বাংলার শব্দ প্রভৃতির প্রয়োগও অনিবার্য হয়ে পড়েছে—অসাগর[৭৫], ইস্ত্রী[৭৬], উরমাল[৭৭], আণ্ডড়[৭৮], লেণ্ডর[৭৯], উভলেজ[৮০], ঘুর্‌ঘুট্টি[৮১], গুাল[৮২], হ্যাল[৮৩]—এসব তো আছেই, তাছাড়া কাঁখে পোলা[৮৪], কি তুরু মনে[৮৫], হলাম অপমানী[৮৬], লুকি হলেন[৮৭], চৈতন করে গা'ও[৮৮]—এ ধরনের কথাও যথাস্থানে একেবারে মোক্ষম বসেছে। এক-এক সময় আবার জোড়কলম শব্দের প্রয়োগও কম কৌতুকাবহ নয়; কি পোলো—কিপ্পোলো[৮৯], ফাল হোলো—ফাল্লোলো[৯০], তোপ পোলো—তোপ্পোলো[৯১], লে আও—ল্যাও[৯২] ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কত অসংখ্য ছড়া লিখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ! তাদের যুগ্মপংক্তিগুলিতে সার্থক মিলের ছড়াছড়ি। কিন্তু অবাক লাগে যখন দেখি, যথোচিত কৌতুক-রস সৃষ্টির জন্যে তিনি অনেক সময় ইচ্ছে ক'রেই একটুখানি ত্রুটি রেখে দিয়েছেন তাঁর কতকগুলি অন্ত্যমিলে, আর তা করেছেন শিল্পেরই প্রয়োজনে। বুদ-ছুট[৯৩] কাঁসি-মাছি[৯৪], চিন্তা-শিমটা[৯৫], মরতে-হত্যো[৯৬], বিকট-বৃহৎ[৯৭], পত্র-কষ্ট[৯৮] কুত্র-ক্ষুদ্র[৯৯]—এরকম অনেকগুলি দৃষ্টান্ত চোখে ভাসে।

আর কেবল একটা কথা: রূপানুষঙ্গের ব্যাপারে বাক্-ধ্বনির তির্যক ইঙ্গিত অবনীন্দ্রনাথের মনকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেত তা অন্যের পক্ষে কল্পনা করাও দুরূহ। কথার অর্থ হল এক, আর তার শব্দধ্বনির ইঙ্গিতে ছবি বেরিয়ে এল একেবারে অন্য—এরকম ঘটনা তাঁর কাছে ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাই জোড়াসাঁকোর ধারে'তে বলছেন—

> শিশুবোধক পড়তুম, বড়ো চমৎকার বই, অমন বই আমি আর দেখি নে। এখনকার ছেলেরা পড়ে না সে বই—

কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিচ্ছে
কাঠায় কুরুবা কুরুবা লিচ্ছে…

আমার যাত্রার ছাগলের মুখে এই গান জুড়ে দিয়েছিলুম। কেমন সুন্দর কথা বল দিকিনি, যেন কুর কুর করে ঘাস খাচ্ছে ছাগলছানা। পৃ ১১৫

এর পরে আর কথা চলে না। শুভংকরের আর্যা তাঁর কাছে 'গান', কাঠার হিসেব তাঁর কাছে 'ছাগলছানা'র ছবি,—এ না হলে অবনীন্দ্রনাথ! কিন্তু এবার আমাদেরও চোখ খুলে দিয়েছেন তিনি, আমরাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ছবিটা : সত্যি 'কুরকুর করে ঘাস খাচ্ছে' তাঁর 'ছাগলছানা', আর সেই সঙ্গে তার ছোট্ট ল্যাজটুকু নেড়ে নেড়ে চ'রে বেড়াচ্ছে কুটকুট করে।

১০

এবার গুটিয়ে আনছি আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা। বলা হল না অনেক কথাই। সবশেষে শুধু ভাবছি, জাদুকরের মতো এ কী কাণ্ড করে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ? তাঁর জাদুর কাছে কোথায় লাগে আলাদীনের মায়া-দীপ? যখন যা বলছেন তখনি তা চক্ষের পলকে এসে হাজির! সম্ভব-অসম্ভবের প্রশ্ন নেই, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই—তাঁর সৃষ্টিলোকে এসে আমরা যেন এক সম্মোহের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি : যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই রূপ—জল-স্থল-আকাশে শতবিচিত্র রূপ—রূপে রূপে অপরূপ! কী করে এ সম্ভব হল? ছিলেন রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকার নেশায়, একদিন বসলেন কলম নিয়ে লিখতে, অমনি তাঁর হাতে খুলে গেল আরো এক রূপমায়ার জগৎ। এত বর্ণময়, এত চিত্রবিচিত্র বিপুলসংখ্যক ছবি বোধ করি তুলির মুখেও এঁকে যান নি তিনি। কিন্তু এর জন্যে খুব কি ভাবতে হয়েছিল তাঁকে? মোটেই না। সেই যে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, 'তুমি লেখো না, যেমন ক'রে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো'…—ঐ তো মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেলেন 'সিসেমে'র দরজা খোলার আসল চাবিকাঠি। তাই দিয়ে মনের গুহাদ্বার খুলতেই দেখা দিল অতুল ঐশ্বর্যের রত্নভাণ্ডার,—চোখ আর ফেরানো গেল না।

সেই মুঠো-মুঠো মণিমুক্তো তিনি আজ ছড়িয়ে রেখে গেছেন আমাদের চোখের সামনে; আমরা অবাক হয়ে দেখছি, এর মধ্যে একেবারে আসল

রত্নটি হচ্ছে স্পর্শমণি যার ছোঁওয়ায় বাইরের জগতেরও সব-কিছুই মুহূর্তের মধ্যে সোনা হয়ে যাচ্ছে, তুচ্ছতম জিনিসটিরও রূপ-রঙ যাচ্ছে বদলে। দেখে দেখে বারবারই কেবল মনে পড়ছে 'আলোর ফুলকি'র কুঁকড়োর সেই আশ্চর্য কথাগুলি—

> এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফালটা আলো পেয়ে…কত রকমই রঙ ধরছে।‥ পলকে পলকে এখানকার সব জিনিসই নতুন নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আলোতে। আমিও…রোজ রোজ কত আশ্চর্য ব্যাপারই দেখছি। দেখে দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না; চোখের দৃষ্টি আমার, নতুনের পর নতুন ছোটো এই গোটাকতক জিনিসের অফুরন্ত শোভা, এই ক'টা সামান্য জিনিসের অসামান্য রূপ দেখতে দেখতে, দিন দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে…
>
> —মহা বিস্ময়ে। —পৃ ২৩-২৪

এ দৃষ্টি অবনীন্দ্রনাথের।

উল্লেখপঞ্জী

১. প্রথম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ৩
২. থাপছাড়া : রবীন্দ্র-রচনাবলী : একবিংশ খণ্ড, পৃ ৩
৩. বুড়ো আংলা — পৃ ১৭৯
৪. বুড়ো আংলা — পৃ ১৭৪
৫. „ „ — „ ১০৪
৬. „ „ — „ ১০৬
৭. „ „ — „ ৮৫
৮. „ „ — „ ১০৫
৯. „ „ — „ ১২৫
১০. লম্বকর্ণ পালা — „ ৮৮
১১. „ „ — „ ১২৭
১২. আলোর ফুলকি — „ ৭১
১৩. আলোর ফুলকি — „ ২৭
১৪. „ „ — „ ২৮
১৫. „ „ — „ ১২
১৬. বুড়ো আংলা — „ ১২৪
১৭. বুড়ো আংলা — „ ১৮৭
১৮. চাইবুড়োর পুঁথি — „ ৩৬
১৯. মাকড়ির পুঁথি — „ ৫২
২০. বুড়ো আংলা — „ ১০৬
২১. বুড়ো আংলা — „ ১৩৬
২২. „ „ — „ ১৭৯
২৩. „ „ — „ ১৩৬
২৪. আলোর ফুলকি — „ ৩৪
২৫. আলোর ফুলকি — „ ৩১
২৬. „ „ — „ ৩৭
২৭. বুড়ো আংলা — „ ১৮১
২৮. বুড়ো আংলা — „ ১৮০
২৯. „ „ — „ ১০৭
৩০. „ „ — „ ১০৮
৩১. „ „ — „ ৭২
৩২. „ „ — „ ৭২
৩৩. „ „ — „ ৩৭
৩৪. „ „ — „ ১০৩

৩৫. রং-বেরং	—	,,	২৬	৩৬. আপন কথা	—	,,	৩৯
৩৭. বুড়ো আংলা	—	,,	১৮২	৩৮. বুড়ো আংলা	—	,,	১৮৩
৩৯. মাসি	—	,,	৩৯	৪০. মাসি	—	,,	৩৯
৪১. আলোর ফুলকি	—	,,	৩৬	৪২. আলোর ফুলকি	—	,,	৪৪
৪৩. ,, ,,	—	,,	৪৫	৪৪. ,, ,,	—	,,	৪৫
৪৫. ,, ,,	—	,,	১২	৪৬. ,, ,,	—	,,	৭১
৪৭. ,, ,,	—	,,	১৩	৪৮. ,, ,,	—	,,	১৮
৪৯. ,, ,,	—	,,	৩	৫০. বুড়ো আংলা	—	,,	১২৭
৫১. বুড়ো আংলা	—	,,	১২৭	৫২. ,, ,,	—	,,	৭৫
৫৩. একে তিন তিনে এক		,,	১৩	৫৪. কিশোর সঞ্চয়ন	—	,,	১০১
৫৫. লম্বকর্ণ পালা	—	,,	৭৭	৫৬. বুড়ো আংলা	—	,,	১৭৯
৫৭. ভূতপতরীর দেশ	—	,,	৩১, ৪৪	৫৮. কিশোর সঞ্চয়ন	—	,,	৮০
৫৯. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৪৩	৬০. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৩০
৬১. ,, ,,	—	,,	৩২	৬২. মাসি	—	,,	৪১
৬৩. ,, ,,	—	,,	৪২	৬৪. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৪৬
৬৫. মারুতির পুঁথি	—	,,	৭১	৬৬ একে তিন তিনে এক		,,	১
৬৭. বুড়ো আংলা	—	,,	১৩০	৬৮. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৬১
৬৯. আলোর ফুলকি	—	,,	৩	৭০. ,, ,,	—	,,	৫৭
৭১. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	১০১	৭২. ,, ,,	—	,,	১৩
৭৩. ,, ,,	—	,,	১৩	৭৪. মাসি	—	,,	৪৩
৭৫. ,, ,,	—	,,	৭৫	৭৬ চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৯০
৭৭. ,, ,,	—	,,	১৫	৭৮. ,, ,,	—	,,	৭৪
৭৯. মাসি	—	,,	৪৩	৮০. ,,	—	,,	৩৭
৮১. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৫৭	৮২. ,, ,,	—	,,	৮৩
৮৩. ,, ,,	—	,,	৪২	৮৪. ,, ,,	—	,,	৮
৮৫. মারুতির পুঁথি	—	,,	২১	৮৬. ,, ,,	—	,,	১০০
৮৭. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	২২	৮৮. কিশোর সঞ্চয়ন	—	,,	৮২
৮৯. কিশোর সঞ্চয়ন	—	,,	৯৩	৯০ চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৬২
৯১. চাঁইবুড়োর পুঁথি	—	,,	৬২	৯২. ,, ,,	—	,,	৪২
৯৩. ,, ,,	—	,,	৯	৯৪. ,, ,,	—	,,	২৯
৯৫. ,, ,,	—	,,	৩৬	৯৬. ,, ,,	—	,,	৩৯
৯৭. ,, ,,	—	,,	৭৫	৯৮. ,, ,,	—	,,	৯৫
৯৯. রং বেরং ,,	—	,,	৪৫	১০০. জোড়াসাঁকোর ধারে		,,	১২২

বিচিত্র বাণীচিত্র

১

ছড়া রচনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল অসামান্য। তাঁর মুখের কথাতেও অনেক সময় ধরা পড়ত ছড়ার ছন্দ। আসলে তাঁর মন ও মেজাজ দুটিই ছিল ছড়া রচনার অনুকূল। গদ্যকাহিনী হলেও তাঁর প্রথম বই শকুন্তলার অনেক স্থানেই ফুটে উঠেছে ছড়ার আদল। আর ক্ষীরের পুতুলকে তো আগাগোড়া ছড়াই মনে হয়।

বহু বিচিত্র ধরণের ছড়া লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ, তবে মোটামুটিভাবে এদের দুটো বড়ো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলিতে খাঁটি 'ছেলে ভুলানো ছড়া'র ঢঙ, তাদের বিষয়গুলিও সাবেক কালের; আবার কতকগুলির বিষয়বস্তু একেবারে হাল-আমলের, ছড়ার মেজাজও তাই। এখানে দুই শ্রেণীর ছড়ারই সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমে ধরা যাক খাঁটি 'ছেলে ভুলানো ছড়া' জাতীয় রচনা। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' তো একেবারে আদি অকৃত্রিম ছড়া। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও এটি প্রভাবিত করেছে। তাঁর 'দিনের আলো নিবে এল' কবিতাটিই এর প্রমাণ। অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু একে দীর্ঘ কবিতা না ক'রে খাঁটি ছড়াই রেখে দিয়েছেন, আর তাতে ধ'রে রেখেছেন বাদলা-দিনের সামান্য একটুখানি নিসর্গ-বর্ণনা—

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাজছে মাদল গামুর গুমুর
চাল ডাল আর মক্কা মসুর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে—
জলের সাথে নামে—
ঘরে ঘরে নামে—
টাপুর টুপুর গামুর গুমুর
গামুর গুমুর টাপুর টুপুর।

—বুড়ো আংলা পৃ ৭৫

কিংবা দেখা যাক বর্ষাদিনের আরো একটা ছবি—

মেঘ লেগেছে কালা ধলা
বইছে বাতাস জলা-জলা
বরফ-গলা পাগলা-ঝোড়া
শুকনা ধুয়ে আসে
তিষ্টা নদীর পাশে—
ঝাপুর ঝুপুর ছাপুর ছুপুর
ছাপুর ছুপুর ঝাপুর ঝুপুর।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৬

অথবা—

ফুল দিল সব ঘোমটা টেনে
বিষ্টি এল হেনে
ছুঁচোয় গড়েছে মাটির টিপি
বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি
সাগরের পাখি ডাঙায় গেল
ঝড়-বিষ্টি বুঝি এবার এল।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৭

এ ছাড়া ঝড় বৃষ্টি শিল বাজ—সব কিছু জড়ানো তাঁর 'শিল পড়ে তড়বড়' ছড়াটি তো শিশুদের মুখে মুখেই ফিরছে।

থাক নিসর্গ-বর্ণনা। শেয়াল, গোরু, মোষ, ইঁদুর, পাখি—এরা হল ছড়ার রাজ্যের নাম-করা বাসিন্দা। এরা না থাকলে ছড়া হয়? অবনীন্দ্রনাথ তাই ছড়ার শেয়ালকে নিয়েই শুরু করলেন—

তাকুড় তাকুড় তাকা
যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা
থাকে থাকে থাকে
হুক্কাহুয়া ডাকে!
চাঁদপুরের কাঁকড়া বুড়ি
কামড়েছে তার নাকে!

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৫১

অন্যত্র শেয়ালের মুখেই বসিয়ে দিয়েছেন—

এক যে ছিল একা-নোড়ে
সে থাকে তালগাছে চড়ে

—ভুতপত্রীর দেশ পৃ ৮০

কিংবা—

বাপ ভনরি!
কি খাইতে সাধ করেছ?—চাল মসুরি?…
বাপ নন্দলাল!
কি খাইতে সাধ করেছ?—পাকা তাল?

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৯

এদিকে গোরু-বাছুর ঘোষও এসে হাজির—

গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হাম্বা নেহাল বাছুর
ঘোল মউনি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর
ভালো দুধ টকো দই দিচ্ছে সেথা বাস
ঘোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গোরু চিবায় ঘাস।

—বুড়ো আংলা পৃ ১৭৩

চুয়ো-ই বা বাদ পড়ে কেন?—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো
ধেংটিধিং নিগিরিটিং
ধাতিং তিং নাতিং থিং…'

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৬০

আর পাখিদের কথা কত বলব? অবনীন্দ্রনাথের ছড়া আর রূপকথার জগতের একটা বড়ো অংশই তো তাদের দখলে। তাদের মুখের সাদা কথাও অনেক সময়েই শোনায় ছড়ার মতো। ভোর হতে-না-হতেই শুরু হয় মোরগের সংসার-চিন্তা। মুরগিকে ডেকে বলে—

কুড়ুক কুক্কুটি! রোদ উঠি উঠি,
পিঁয়াজ গুটি গুটি মিরিচ বুটি
শাবক দুটিরে কি দিবি নাস্তা
বাদাম না পেস্তা না ফুটি!

—রং-বেরং পৃ ৪৮

সত্যি ভাববার কথা ; নিজেদের কথা নয় বাদই দেওয়া গেল, কিন্তু ভোরবেলা 'চুজা' আর 'চিংগান'—ছানা দুটিকে কি খেতে দেওয়া যায় ? উত্তরে মুরগি বলে—

ফজিরে উঠি তদবিরে ছুটি
বিছুটি বন হতে অনেক দূর।
পোকা পাকাটি যা পাই খুঁটি
চুজারে খাওয়াই, চিংগানে খাওয়াই···
কাম কাজে···নাই কসুর।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৯

থাক মোরগ-মুরগির গৃহস্থালীর ব্যাপার। ওদিকে 'বুড়ো আংলা'র সেথো হাঁসেরা সোঁ করে উপরে উঠে আসতেই উপরের হাল্‌কা হাওয়ায় তাদের ওড়ার বেগ গেছে বেড়ে। চকা বলছে—

জোরে চলায় নেই কোনো দায়
আস্তে গেলেই হাঁপ ধরে যায়।

দলের সঙ্গে উড়তে চেষ্টা ক'রে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস তলিয়ে যাচ্ছে দেখে চকা নির্দেশ দিচ্ছে উপরের হাল্‌কা হাওয়ায় উঠে আসতে—

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল
ডানা নেড়ে নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল
উপর বাতাস পাতলা ভারি
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

—বুড়ো আংলা পৃ ৩৭

কিন্তু খোঁড়া হাঁস বেচারা কিছুতেই নিচের ভারি বাতাস ঠেলে উপরে উঠে আসতে পারছে না। চকা রেগে বলে—

উড়তে না পারে ঘরে থাক।
খাক-দাক বসে থাক।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩৮

এখানে তো তবু ছড়ার আকারে সাজানো পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস। কিন্তু স্রেফ গদ্যে লেখা 'বুড়ো আংলা'র ৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাখিদের সংলাপটিকে আমরা তো খাঁটি ছড়া ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি নে। গ্রামে গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়োরা সব পাহারা দিচ্ছে। আকাশপথে উড়ে-চলা চকার দলের হাঁসেরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাদের কাছে খবর পাচ্ছে—

"কোন্ শহর ?" "নোয়াখালি—খটখটে।"
"কোন্ মাঠ ?" "তিরপুরণীর মাঠ—জল থৈ থৈ।"
"কোন্ ঘাট ?" "সাঁকের ঘাট—গুগলি ভরা।"
"কোন্ হাট ?" "উলোর হাট—খড়ের ধুম।"…
"কোন্ বাজার ?" "হালতার বাজার—পলতা মেলে।"
"কোন্ বন্দর ?" "বাগা-বন্দর—হুক্কাহুয়া।"
"কোন্ জেলা ?" "রুরুলি জেলা—সিঁদুরে মাটি।"
"কোন্ বিল ?" "চলন বিল—জল নেই।"…
"কোন্ দীঘি ?" "রায় দীঘি—পানায় ভরা।"
"কোন্ খাল ?" "বালির খাল—কেবল চড়া।"
"কোন্ ঝিল ?" "হীরা ঝিল—তীরে জেলে।"
"কোন্ পরগণা ?" "পাত্‌লে দ—পাতলা হ।"

এবং সব শেষে সেই মোক্ষম কথাগুলি—

"কার বাড়ি ?" "ঠাকুর বাড়ি।"
"কোন্ ঠাকুর ?" "ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।"

২

এমনি ক'রে ধীরে ধীরে আমরা 'ছবি-লিখিয়ে' 'ওবিন ঠাকুরে'র চলতি-কালের ছড়ায় এসে পৌছেছি। আদ্যিকালের বর্ষার সেকেলে ঢঙের ছড়ার নমুনা গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এবার শোনা যাক একেলে বর্ষার হাল-আমলের ছড়া—

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি
হবে না তো সিটি!
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!
জল না হলে গাছে গাছে ফলে পেঁপে আতা?
জল না হলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা!
হত না কো রবার গাছে, কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখো—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেকো।

সকালে পাবে না চা, দুপুরেতে ভাত
বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জ্বলবে আঁত,
না পাবে নদীতে মাছ, খেতেতে ফসল—
ফোঁটা ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখের জল !

—বুড়ো আংলা পৃ ৭৭

এও পাখিদেরই কথা। 'পাগলা-ঝোড়া'র কাছে পায়ে রবারের জুতো, গায়ে ওয়াটর প্রুফ্, নাকে-কানে জড়ানো গলাবন্ধ, মুখে মোটা চুরুট, মাথায় খোলা ছাতা, হন্ হন্ ক'রে ছুটে চলা কলকাতার বাবুটির প্রতি হাঁসেদের এই হুঁশিয়ারী কৌতুকপ্রদ এবং উপভোগ্য।

আর হাল-আমলের মানুষের ছড়ার তো সীমাসংখ্যাই নেই। তবে অনেক সময়ে এদের টেনে বের করে আনতে হয়, কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা মুখ লুকিয়ে আছে পালাগানগুলির মধ্যে—বর্ণচোরা হয়ে। সেখানে তারা কখনো গান, কখনো সংলাপ, কখনো স্বগতোক্তি। কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

হাতে হাতঘড়ি পায়ে কেট্‌স্
মুখে সিগারেট দিচ্ছে ফুঁ।
উড়ুনি নাই ধুতির বাহার
খদ্দরের সার্ট তাতেই কলার
ঘাড় কামানো অ্যালবার্ট টেরি
দেবী কি দেবা চিনতে দেরি !
অধরে পানের লেগেছে ছোপ
কড়িপানা চোখ আধখানা গোঁফ।

—লম্বকর্ণ পালা পৃ ১৯

বেলেঘাটা ক্রেসিন ব্যাণ্ডের লাটুবাবু ওরফে নটবরের এই ছবিটা একেবারে হাল ফিলের, বর্ণনাটাকেও প্রায় সর্বাঙ্গীণ বলা চলে। এ-রকম চরিত্রের একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তবু পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেসিন ব্যাণ্ডের নরহরির গানটাও শোনা যাক—

খরচা নাই যে দিই কিছু পেটে
জামা আছে জেব গেছে কেটে
বেয়ালার তাঁত নাই কান নাই
লোপাট ফ্লুটের চাবি কটাই

বাঁয়া-তবলা জোড়া গেছে ফেটে।
ক্রেসিন ব্যাঙও খেয়েছে ঘেঁটে
ছাগল চিবাল লোহার কর্তাল
বাঘের যাহা সয় না পেটে। —পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৬

কথার বিশিষ্ট ধরন থেকে বুঝতে দেরি হয় না যে উপরের দৃষ্টান্ত দুটি গানের ছদ্মবেশে ছড়ারই রকমফের। শেষের উদ্ধৃতিতে সর্বনাশগ্রস্ত ক্রেসিন ব্যাঙের নিঃসম্বল নরহরির শোচনীয় চিত্রের সঙ্গে আধুনিক কালের ক্ষুধাসর্বস্ব লম্বকর্ণ ছাগলের পরিচয়টিও ভালো ক'রেই পাওয়া গেল। শুধু ছাগল কেন, আধুনিক যুগের ঘোড়ারাও কিছু কম যায় না—

হরিহর দত্তর জল-ছত্তর ঘোড়া,
কাজ দেয় বিস্তর
বাঁচে ষাট বচ্ছর
খেয়ে শুধু কাঁকড় নুড়ি নোড়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৬৯

আবার কলের যুগে কাঠের ঘোড়ারও চলচ্ছক্তি 'বলচ্ছক্তি' দুই-ই রয়েছে। দুদিন পরেই হয়তো বেরোবে এরোপ্লেন-মার্কা পক্ষিরাজ—

কাঠের ঘোড়া কাঠের ঘোড়া
জল পী পী মাঠের ঘোড়া
নারদ মুনির ঢেঁকিশালের ঘোড়ার জোড়া
নামটা জগৎজোড়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৩

যাক্, ফিরে আসি মানুষের কথায়। আজকালকার দুনিয়ায় মানুষ আছে নানান্ ধরনের—শুধু নটবর-নরহরি তো নয়! সাধুবেশী শঠের অভাব নেই পথে-ঘাটে। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার কথার সঙ্গে ছিটে-ফোঁটা সংস্কৃতও ঝাড়েন। এঁরা—

সোনা রূপা রাং দীয়তাং লীয়তাং
যা হাতে পান তাই নিয়ে যান।
কিছু দিয়ে যান বাকি নিজে ভুজ্যতাং
তুচ্ছ ধনে কিসের এত টান?

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৩৪

আশ্চর্য! এটাও 'গান'! আরো একরকমের মহাজন আছেন যাঁরা ঘাঁটি-আগলানো খাটিয়াদার,—নিজের খাটিয়াটিতে স্রেফ বসে থাকেন আর দশটি সাধারণ মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে খান—

গোবিন্দপুর সুতামুটির মধ্যস্থান খাটিয়াটি,
বসে থাকি হাতে জাঁতি
সুন্দরবনের সুপারি কাটি
থেকে থেকে মারি তবলায় চাঁটি
অধিক করি নে হাঁটাহাঁটি।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪২

এখানে রূপকচ্ছলে ব্যবহৃত 'খাটিয়া' কথাটি একটুখানি সেকেলে হলেও এই খাটিয়াদারদের ব্যবসাটা পূর্বাপর ঠিকই চলে আসছে, বাইরের ভোলটুকু পাল্‌টেছে মাত্র। কিন্তু রূপক-বর্জিত ভাষাতেও অবনীন্দ্রনাথের ছড়া আধুনিককালের অনেক কথাই বলতে পারে। এক-কালে বিজয়া-প্রভাতের গান ছিল—

গা তোলো গা তোলো বাঁধ মা কুন্তল
ওই এল ঈশানী তোর বিষাণী।

আর এ-কালে ভোরের বৈতালিক হল—

গা তোলো গা তোলো কাজে চলো কাজে চলো
চিমনির ধোঁয়া রঙে ওই শোনো বাঁশি বলে
আপিসের বেলা হল।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৮

কিন্তু কে তুলবে গা? রাত্রে ঘুম হয়নি একফোঁটা। সারারাত ঘরে চলেছে 'ছুঁচোর কেত্তন'—

টুপ্ টাপ্ টিপ্
দেড় প্রহর রাতে ঠিক
ইন্দুরে সিন্দুক কাটে—খিট্ খাট্ খিট্।

ইঁদুরের সঙ্গে জুটেছে ঘর-ভরা পোকা-মাকড়-ঝুল—

চিঠিপত্র কীটদষ্ট, ঝুলটানা শীট—
কিট্ কিট্—কালো কিট্ কিট্

—কিশোর সঞ্চয়ন পৃ ১৯৭

পলস্তারা-খসা নোনা-ধরা দেয়াল,—অন্ধকার ঘুপসি কুঠুরির এককোণে হেঁসেল, আর এক কোণে নড়বড়ে তক্তপোশের উপরে তেলচিটে বিছানা—

কালো কালি, কেলে হাঁড়ি
ঘুটের কাঁড়ি
ভূতের বাড়ি—ঝামা ইট—
কালো কিট্ কিট্—তোশকের ছিট
মাথার বালিশ—তেল চিট্ চিট্—

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৯৭

এর চেয়ে বাস্তব ছবি আর কী হতে পারে ?

বলতে বলতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গের আরো একটা কথা মনে আসছে। মানুষের উপরে যুগ-প্রগতির প্রভাব যতই সক্রিয় হোক প্রেতলোকের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই তার আওতার বাইরে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ছড়ায় দেখতে পাচ্ছি কেয়াতলার ভূতেরা তাদের 'বিদকুটে চেহারা' আর 'দাঁত ছিরকুটে হাসি' সত্ত্বেও একটা বিষয়ে বেশ খানিকটা শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছে। যতই তারা ছুটোছুটি হুটোপুটি করুক তাদের গতি এখন আর ছন্দ-ছুট নয়। তারা—

উড়ছে কতক ভনভনিয়ে
চলছে কতক হনহনিয়ে
চলছে কতক গাছতলাতে
ঢুলছে কতক তালপাতাতে।

এবং উদ্দাম বেগে এগিয়ে চলা তাদের চক্রনৃত্যটাও উপভোগ্য—

সব ভূতুড়ে সব ভূতুড়ে
ঘূর্ণি হাওয়ায় চলছে ঘুরে…
সব ভুতুড়ে ভূতের খেলা
খেজুর তলায় ইটের ঢেলা।

—ভূতপত্রীর দেশ পৃ ২২-২৬

৩

ভাবছি,—পুঁথি-পাঁচালী, পালাগান আর গল্পকথার বইগুলিতে কত অজস্র ছড়া ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের। আর কী নেই তাতে? খনার বচন থেকে

শুরু ক'রে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান, মায় ঘটি চালানোর মন্তর-তন্তর পর্যন্ত সবই তাঁর ছড়ার উপাদান—

রোহিনীতে শনির দৃষ্টি
সে কারণে হয় না বৃষ্টি

—চাঁইবুড়োর পুঁথি পৃ ৮৮

কিংবা—

পতিহীনা মানুষীর এক দিন একাদশী

আর পতিহীনা রাক্ষসীর ?—

পাঁচদিন পঞ্চদশী !

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৭

এসব তো আছেই, তাছাড়া যমের বাড়ির হদিস পাবার জন্যে ত্রিজটী এসে ঘটি-চালা মন্তর পড়তেই ঘটি চলতে থাকে—

ঘটি চলে ঘটি চলে
নোনা জলে মিঠে জলে
পূবে পশ্চিমে উত্তরে।
হাট নিশুতি বাট নিশুতি
ঘটি চলে গুটি গুটি।
হয়ে নিশুতির বাট
ঘটি এল দক্ষিণ পাট।...

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৫৪

অবশ্য ঘটি-চালা মন্তর লৌকিক তুক্-তাকের সমগোত্র—তাই এর জন্যে সাধারণ লৌকিক ভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু ছিটেফোঁটা অনুস্বার না ছড়ালে সাধারণ লোক কোনো-কিছুকে 'শাস্তর' ব'লে মানতে চায় না। তাই ছড়ায় সে ব্যবস্থাও আছে—

বিড়ম্বে নাড়ম্...
যাত্রাং কুরু যাত্রাং কুরু
আগে দুষ্টং জনে তুষ্টং কুরু
পরে শিষ্টং জনে তো কুরু
কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ু।

—লম্বকর্ণ পালা পৃ ৮৫

শুধু শাস্ত্রবিধি নয়, যে-কোনো প্রাজ্ঞোক্তিকেও একেবারে সাদা বাংলায় বললে লোকে গুরুত্ব দিতে ইতস্তত করে ; তাই বাধ্য হয়েই বলতে হয়—

মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে
কে বলে সিটি বৃক্ষাগ্রে
জেনে রেখো ভাই সর্বাগ্রে—
মধুমক্ষিকার সাচ্চা বুলি
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮২

যেহেতু এরা 'মধুমক্ষিকা', সুতরাং 'তিষ্ঠতি' 'জিহ্বাগ্রে' 'বৃক্ষাগ্রে' 'সর্বাগ্রে' প্রভৃতি কঠিন-কঠিন সংস্কৃত শব্দ তারা ছাড়া আর কে বলবে? কিন্তু সাধারণ লোকে এদের আবার মৌমাছি ব'লে জানে,—সেটাও একটা কথা। তাই সাধারণের বোধগম্য ক'রে ভাষার একটুখানি ইতর-বিশেষ ক'রে বলা হল, 'মনে রেখো ভাই', এদের কথাটা 'সাচ্চা বুলি'। এতে দুদিক-ই রক্ষা পেল।

সংস্কৃতের প্রতি সাধারণ মানুষের অতিরিক্ত সম্ভ্রমবোধের একটা বড়ো কারণ এর দুর্বোধ্যতা। কথা বুঝতে না পারলেই তারা তাকে বিশেষ ক'রে মর্যাদা দেয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছড়ায় এ নিয়েও কৌতুক করেছেন—

অস্তি পয়স্তি চরের একফালি সিকস্তি সরু
তদুপরি আছে খাড়া একটি গভস্তি তরু।
ফল তার নাস্তি—থাকলেও ছোঁয় না মানুষ কি গোরু।

—রং-বেরং পৃ ৪৫

'ছোঁয় না মানুষ কি গোরু'—অবশ্য সকলের কাছেই সহজবোধ্য। 'অস্তি' 'নাস্তি'-ও না হয় অনুমান ক'রে বোঝা গেল। কিন্তু 'পয়স্তি চর' কী? নদীর চর? তাহলে 'সিকস্তি' কি ঐ চরের পাড়?—ক্ষয়ে গিয়ে 'সরু' হয়ে গেছে? আবার 'গভস্তি' কী? বড়ো অভিধান বলছে—'কিরণ'। কিন্তু কিরণ 'তরু' হবে কী ক'রে? তাহলে 'গভস্তি তরু' কি গাবগাছ? হবেও বা। সবটুকু অর্থ বুঝে ফেললে তো কথার গুরুত্বই চ'লে গেল। মনে পড়ছে হিং টিং ছট্-এর সেই 'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণে'র কথা। সেখানেও বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরস সৃষ্টি করাই ছিল কবির লক্ষ্য। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের সেই চারটি পংক্তি—

হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন যতি
হয় শান্ত কি ক্ষান্ত কৃতান্ত গতি
করি গঞ্জিত গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
ত্যজি মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে।

বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী পৃ ৪৬

এ-ও হিং টিং ছট্-এর ব্যাখ্যারই সগোত্র। শোনার পর বলতেই হয়,— ‘পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার!’ কিন্তু এ প্রসঙ্গ এইখানেই থাক।

৪

এবার একটা দিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলতে চাই। তা না হলে আলোচনার একটা বড়ো কথাই বাদ প'ড়ে যাবে। এমন সব উদ্ভট ছোটগল্প লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ যার প্রধান আকর্ষণই হচ্ছে ছড়া। ‘ভবের হাটে হেতি হোতি’ই মন্দ কী? দৃষ্টান্ত হিসেবে ওই একটি গল্পই যথেষ্ট। গল্পের গোড়াতেই দেখছি—

প্রজাপতি সৃষ্টির গোঁসাই
সৃজন করলেন দুটি ভাই।
হেতি হোতি গোল গাল,
একটি কালো একটি লাল।

—রং বেরং পৃ ১০৪

‘রামায়ণের তিনশো বত্রিশ পাতা ছেড়ে বার হয়েই’ দু'ভাই এসে পড়ল একেবারে অলঙ্ঘ্যার চরে। সেখানে—

যোজনের পর যোজন চাই,
নীর-ক্ষীর দেখা নাই…
পুরব পশ্চিম কোথা বা যাই,
উত্তুর দক্ষিণ চেনারও জো নাই।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০৪-১০৫

একটু পরেই দেখি হেতি হোতি খুঁজে ফিরছে জগমুনশির কাছারি। তাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে ত্রিসত্য বাবাজীর দেওয়া ত্রেতাযুগের তে-রঙ্গা সেই খোঁড়া গাই—‘তার ট্যারা-ব্যাঁকা শিং, ট্যারচা দুটো চোখ, চ্যাপটা কপালে আর-একটা চোখের মতো টিপ।’ এদিকে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। তিন পহর রাতে আকাশে দেখা যাচ্ছে—

আঁধার 'পরে চাঁদের কলা,
কতক কালো কতক ধলা
উত্তরে উঁচা—দক্ষিণে কাত
মেঘ দুখানা বিরাট।

তারা চলেছে তো চলেইছে—
পোহায়ও বটে, পোহায় না রাত
হয়ও বটে, হয় না প্রভাত।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০৯

তার পর সে কত ঘটনা! হেতি হোতির দিশারি খোঁড়া গোরুটি গেছে হারিয়ে। তাকে খুঁজতে-খুঁজতে দু'ভাই ঢুকে পড়েছে আচ্ছি বুড়ির খোঁয়াড়ে। দেখে—

গোরু রয়েছে বাথানে,
ষাঁড় রয়েছে উঠানে,
দাওয়ায় শুয়ে বাঘ!
মাচানে শুয়ে বানর,
আড়াতে পড়া টিয়ে,
মুড়াকে দাঁড়কাক!

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১১২

আর সেই তিন বুড়ির নাচ?—খোঁয়াড়ের পাশে বাগানের মাঝখানে ব্যাসকুণ্ডের তিন ধারে ব'সে আচ্ছি বুড়ি, মাচ্ছি বুড়ি আর অস্তিবুড়ি সুপুরি কেলা-কেলি খেলছিল—

এক সুপুরি টুপ্
দুই সুপুরি টাপ্
তিন সুপুরি টিপ্ টাপ্ টুপ্!

হেতি হোতিকে দেখতে পেয়েই তিন বুড়ি তুড়ি দিয়ে জুড়ে দিল নাচ আর গান—

তাক্-তুড়া-তুড়্-তুড়া
ভাঙল খাটের খুরা
ছিঁড়ল তুলার তোষক!
তিন বুড়ির দেখতে নাচন
জুটল দুটো লোক।

অবশ্য 'লোক দুটো' সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক—

তাদের নাম দুটি কী ?

একটি কালো একটি লাল

দেখতে ভালো গোল গাল

কাঁচা সুপুরি !

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১১৩

থাক তিন বুড়ির কাহিনী। ওদিকে আবার পাঁটা ভেট দিয়ে জ্ঞান-বৃদ্ধি নিতে গিয়ে জ্ঞানকুণ্ডুর হাতে হেতি হোতির কী লাঞ্ছনা। জ্ঞানকুণ্ডুর প্রথম কথাই হল—

যেমন দক্ষিণা…তেমনি বিদ্যা দিব দান

হেতি হোতি দুই জনে শুন ধরি' কান—

আর শেষ কথা—

মূর্খজন বুধজন আলাপ না করে

এইটুকু বুঝি এবে যাও স্থানান্তরে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১১৫

এর পর ভাগ্যিস গিয়েছিল তারা কালিকুণ্ডুর কাছে। দু'জনের গায়ে ছোটো দু'বোতল লাল কালো কালি ছিটিয়ে দিয়ে সে তবু অভ্যর্থনা করেছিল তাদের। অবশ্যি কালিকুণ্ডুর ক্রিয়াকাণ্ডেরও মাথামুণ্ডু নেই। ব্যবসা তার কালি তৈরি করা। কারখানা বসিয়েছে তালগাছের ভিতরে। বোতলের মতো গোড়া মোটা গলা সরু একটা তালগাছ,…সেই বোতলি-তালের গাছটার মধ্যে ঘটর ঘটর শব্দে কালিকুণ্ডু দিনরাতই কেবল কালি ঘুঁটছে—

কালি ঘোঁটন, কালি ঘোঁটন,

আর বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়ছে—

নোটন কালি, ঘোঁটন কালি

সবার দোতের ঘন কালি

আমার দোতে আয়—

কালি ঘোঁটন কালি ঘোঁটন

ঘট-ঘটেশ্বরের পায়।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১১৮

কিন্তু আর দরকার নেই। ভাবছি, কী বলব লেখাটাকে ? ছড়া-ছিটনো গল্প

না গল্প-ছিটনো ছড়া? আর গল্পের কাহিনী? সে যে কখন ছিঁড়ছে কখন জুড়ছে বোঝবারও জো নেই—সবটাই ছড়ায় ছড়ায় ছত্রাকার।

৫

অবনীন্দ্রনাথের ছড়ার জগতে সাধারণভাবে খানিকটা ঘুরে আসা গেল। এবার দেখা যাক স্বয়ং ছড়াকারকে—আধুনিক কালের সেই আশ্চর্য মানুষটিকে—ভোরবেলা, যাঁর ঘুম ভাঙে আদ্যিকালের কাক-কোকিলের ডাকে, আর সারাদিন কাটে ভাবীকালের অগ্রদূত ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এই ভাব-মূর্তিটি কিন্তু তাঁরই রচনা। তিনি নিজেই এঁকেছেন এটি পরম কৌতুকে। 'একে তিন তিনে এক'-এ তাঁর গুণমুগ্ধ ছিরিপদ তাঁকে নিয়ে পাঁচালী রচনা ক'রে গাইছে—

নিশি পোহাইয়া গেল কোকিল কাড়ে রাও—
শয্যা হইতে অবনীন্দ্র চৈতন করে গাও।

তারপর যথারীতি সাজ-পোশাক প'রে তৈরি হয়ে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ চললেন ফুলটুঙির ঘরে—

ফুলটুঙির ঘরে গিয়া দেওয়ানে বসিল।

ফুলটুঙির ঘরে ছোটো-ছোটো ছেলে আর মেয়ে। একটু পরেই দেখা গেল তাদের নিয়ে নিজেই শিশুর মতো খেলায় মেতে গিয়েছেন তিনি—

ছাওয়ালের বুক ধরে আছেন খেলিতে।

আর ছোটোদের মাঝখানে তাঁকে দেখাচ্ছেও ভারি চমৎকার—

কাঁধেতে লয়েছে ঝোলা হাতে খেলা আর
চিত্রকরা শাল অঙ্গে দিয়েছে বাহার।

—একে তিন তিনে এক পৃ ১৮

অবনীন্দ্রনাথের ভিতরকার মানুষটির এর চেয়ে সত্য পরিচয় আর কী আছে? যতই 'চিত্রকরা' 'বাহারে' 'শাল' 'অঙ্গে' জড়ানো যাক, তাঁর মন বাঁধা প'ড়ে আছে শিশুদের কাছে। 'ফুলটুঙির ঘরে' গিয়ে 'দেওয়ানে' বসেছেন তিনি তাদেরই জন্যে। তাঁর 'কাঁধে'র 'ঝোলা'টির ভিতর লুকিয়ে আছে শিশুদের পরম কৌতূহলের সামগ্রী। একটি-একটি ক'রে তিনি সেগুলো বের করছেন তাদের সামনে, আর তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝলক দেখে তাঁর নিজের বুকটাও ভ'রে উঠছে খুশিতে।

আসলে একটি 'কৌতুকপ্রিয় শিশুদেবতা' তাঁর মধ্যে জীবন-ভোর বাসা বেঁধে ছিল। কৌতুহলী শিশুর মতো চারদিক থেকে কৌতুকের সামগ্রী সংগ্রহ করাতেই তাঁর আনন্দ। সামান্য জিনিসের মধ্যেও তিনি দেখেছেন অসামান্যকে, আর রূপ দিয়েছেন তাকে আপন সৃষ্টিতে। শিশুর মতোই মুক্তমানস তিনি। কোনো বিশেষ সংস্কারেই বাঁধা পড়ে নি তাঁর মন, কোনো বিশেষ যুগের গণ্ডিতেও না। একাল সেকাল সবকালেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। তাঁর রূপকথা, ছড়া, গল্প, স্মৃতিকথা, পুঁথি, পালাগান, গদ্যকবিতা—সব কিছুতেই রয়েছে এর প্রমাণ।

এদিকে শিশুরাও ভাবত তাঁকে তাদের একান্ত আপন। তাঁর মুখে গল্প শোনবার জন্যে কী তাদের আগ্রহ, কী ব্যাকুলতা। তিনি গল্প বলবেন শুনলে শিশু-রাজ্যে উৎসব প'ড়ে যেত। কেননা তাদের মনের মতো গল্প তিনিই বলতে পারতেন, তাদেরই একজন হয়ে। এর আসল রহস্যটি অবশ্য লুকিয়ে আছে তাঁর নিজেরই প্রকৃতির মধ্যে। নিজের ছেলেবেলাকে একটি দিনের জন্যেও ভুলতে পারেন নি অবনীন্দ্রনাথ। শিশু-মনোরঞ্জনের জাদুমন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন তিনি ছেলেবেলাতেই—তাঁর একান্ত প্রিয় পদ্মদাসীর কাছে। সেই যে শিশুকালে তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁর গাল চাপড়াতে চাপড়াতে পদ্মদাসী গুনগুন ক'রে গাইত—'ঘুমতা ঘুমায়', তার রেশটি শেষ জীবনেও লেগে রয়েছিল তাঁর কানে। তাই তো লিখতে পেরেছেন—

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমেতে ঘুমায়
রাত বিরেতে চাঁদটা ঘুমায়
নীলের ক্ষেতে বাদলা ঘনায়
ঘুম যায় গাঙের বাতাস—স্-স্…
নিশার পিদ্দিম— রাতের আকাশ—শ্ শ্…

—কিশোর সঞ্চয়ন পৃ ১৯৫

লিখতে পেরেছেন, 'নিদ্রা পরীর তন্দ্রা-পরীর গান'—

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায়
রাতের পাখি গাছের কোলে,
দোলে দোলে কোলের ছেলে মায়ের কোলে।

কিংবা—

নিদ্ পাড়ে নিদ্ পাড়ে
হিম নদীর জল
আলো-ছায়ায় নিদ্ পাড়ে
নীল পাহাড়ের ঢল!

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২১২

ছড়ার আলোচনা এখানেই থাক, এবার যাই অন্য প্রসঙ্গে। শুধু এইটুকু ব'লে রাখি, ছড়া আর ছড়ার বিবর্তিত রূপ এক জিনিস নয়। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে কিছুটা বলা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে—আরো খানিকটা বলা হবে পালাগানের আলোচনা প্রসঙ্গে।

৬

ছড়া জিনিসটা আদ্যিকালের হয়েও চিরকালের, সকল যুগের সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে। কিন্তু পুঁথি-পাচালী তা নয়। এরা একেবারেই সেকেলে। পুরাণ-মহাকাব্যের কাহিনী আর মধ্যযুগীয় লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক ধর্মবিশ্বাস এদের প্রধান অবলম্বন। তবে এখন যুগ গেছে পালটে, লৌকিক ধর্মবিশ্বাস আজ শিথিল, পুরনো সংস্কার জীর্ণপ্রায়, আর ভক্তিরসের পাত্রেও পড়েছে তলানি। তাই এ যুগে নূতন ক'রে পুঁথি-পাচালী প্রণয়ন যেমন অস্বাভাবিক তেমনি বেমানান। অথচ চোখের উপরে দেখছি, এই বিশ-শতকেও টাইবুড়োর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নাকে চশমা এঁটে পাতার পর পাতা পুঁথি লিখে চলেছেন অবনীন্দ্রনাথ, আর কথকতার চৌকিখানা সামনে নিয়ে পুঁথি-পাঠের আসর জমিয়ে বসেছেন একভিড় ছেলে-বুড়োর মাঝখানে। ব্যাপার কী?

কৌতুকপ্রিয় অবনীন্দ্রনাথের লৌকিক মনটিকে (folk mind) যাঁরা ভালো করে জানেন আর তাঁর 'কথকতার ঢঙে'র সরস বাচনভঙ্গির সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত তাঁদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁরা ঠিকই জানেন, পুঁথির ঢঙে লেখা হলেও তাঁর এসব রচনার জাত আলাদা। লৌকিক ভক্তি-বিশ্বাসের ধার দিয়েও যায় না এরা—এদের মূল রস হাস্যরস আর সবটাই কৌতুক। এরা আকারে পুঁথি, প্রকারে প্রহসন।

হাস্যরস উদ্রেকের মূলে ক্রিয়া করে এক ধরনের অসংগতিবোধ। এই অসংগতি গোড়াতেই ধরা পড়ে পুঁথিগুলোর আকারে আর প্রকারে। বাইরে এদের ধরন-ধারণ পুঁথি-পাঁচালীর বাড়া, কিন্তু ভিতরে তুলকালাম করে বেড়াচ্ছে খেয়ালখুশির খ্যাপা হাওয়া। প্লটের বালাই নেই, কাহিনী এলোমেলো, চরিত্রগুলো উদ্ভট, তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ হঠাৎ-হঠাৎ খাপছাড়া, আর ঘটনাগুলো যেন ভৌতিক সার্কাস—তাতে সব সময় লেগে আছে একটা-না-একটা অঘটন। অথচ মজা এই যে, এ সবের জন্যে কোনোরকম জবাবদিহির প্রয়োজন নেই পুঁথিকারের। তিনি জানেন গোড়ায় ভালো ক'রে আট-ঘাট বেঁধে হাতে কলম বাগিয়ে একটিবার আসনপিঁড়ি হতে পারলেই হল,—তারপর তিনি একেবারে নিরঙ্কুশ। শ্রোতাদের সামনে পুঁথিপাঠের বেলাতেও ওই একই কথা। এ যেন 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো'। আসলে এইটেই চান তিনি—সমস্ত ব্যাপারটাকে হাস্যকর ক'রে তোলা। তাই 'আঁটুনি' যত শক্ত হয় অথচ 'গেরো' যত আলগা রাখা যায় সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। অবশ্য 'ফসকা গেরো'টাকে আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না,—পুরাণ-কথার বেওয়ারিস মাঠে কোনো প্রকারে একটি বার নামতে পারলে পুঁথিকারকে আর পায় কে ? অমনি চৌদুনে হাঁকিয়ে চলেন তাঁর খেয়ালি কল্পনার চৌঘুড়ি। ঘোড়াগুলো গোড়া থেকেই রাশ-ছাড়া, কখন কোন্‌দিকে ছুটছে তার ঠিক নেই। আর সব শেষে থামা না-থামাও তাদেরই ইচ্ছে।

এই তো পুঁথির ভিতরকার কাণ্ড-কারখানা। এদিকে বাইরে 'বজ্র আঁটুনি'র কড়াকড়িটাও হাস্যকর। তবে তা একেবারে যুক্তিহীন ভাবলে ভুল হবে। এবার সেই কথাটাই বলি।

৭

আসল হোক, নকল হোক, পুঁথি হল 'পুঁথি'। 'লঙ্কাদাহে'র পুঁথিও পুঁথি, 'পোড়ালঙ্কা'র পুঁথিও তাই। কাজেই ভিতরে যা-ই থাক, বাইরে পুঁথির সব রকম শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান নিয়মানুষ্ঠান পালন করা চাই। আসল পুঁথির বেলা বরং এক-আধটু কম হলেও চলে, কিন্তু 'নকলে'র বেলা তা মানতে হবে ষোলো আনার উপরে পাঁচ সিকে। কেননা তাকে প্রমাণ করতে হবে সে 'নকল' তো নয়ই, 'আসলে'রও এক ধাপ উপরে।

তা ছাড়া পুঁথি কেবল লিখে গেলেই তো হল না। পুঁথি 'পাঠে'র পূর্বে

এবং পরে কতকগুলি বিশেষ 'কৃত্যে'র নির্দেশ আছে—সেগুলি পালন না করলে 'প্রত্যবায়' ঘটে। 'নকল' পুঁথির বেলা এদের সঙ্গে আরো-কিছু নূতন 'কৃত্য' যোগ করা উচিত। তাই চাঁইবুড়োর পুঁথির শয়ন আছে, জাগরণ আছে, স্নান-আচমন আছে, পুঁথির জন্যে সকালে 'বাল্যভোগ' ও বিকেলে 'শীতল ভোগে'র ব্যবস্থা আছে। কোনো কারণে পুঁথির 'স্পর্শদোষ' ঘটলে শাস্ত্রবিধিসম্মত প্রতিবিধানেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ-সবের সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

'চাঁইবুড়ো মারুতির পুঁথি পাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করছেন আর মন্ত্র পড়ছেন—
হুম্ গণেশ চিংপটাং ততঃ মারুতি চিংপটাং…ইত্যাদি

মন্ত্রপাঠের পর—

আচমন তিনবার, তারপর চারিদিকের শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ ক'রে, পুঁথির একখানি গরান-কাঠের পাটা চিৎ ক'রে রেখে "মারুতি বদতি" ব'লে মরুত্ত-পুরাণ থেকে ধুয়া-বচনটি আওড়ালেন…

—মারুতির পুঁথি পৃ ১

আসরে পুঁথিপাঠ সমাপ্ত হলে ইষ্টদেব স্মরণ করতে হয়—

চাঁইবুড়ো সে-রাতে পুঁথি বন্ধ করলেন—'রামচন্দ্র হে তোমারই ইসচা' ব'লে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৭

পুঁথি-পাঠের পর পুঁথির শয়ন—

পরে কহা যাবে অপর ঘটন,
এবে ফলারম্ভে হোক পুঁথির শয়ন।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৯

এই 'শয়ন' চলতে থাকে পরবর্তী দিনের 'পাঠে'র পূর্ব পর্যন্ত, সেদিন করাতে হয় পুঁথির 'জাগরণ'। তার জন্যেও রয়েছে শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান। পুঁথির 'শয়ন' কালে আবার অঘটনও ঘটতে পারে। মারুতির পুঁথির একটা দিনের ঘটনা তো বিশেষ ভাবেই মনে পড়ছে—

শনি-মঙ্গলবার পুঁথির শয়ন। পশ্চিম কোলোঙ্গাতে উত্তরাস্যে যথাবিধি পুঁথিকে শয়ন করিয়ে,…বুধবারে পুঁথি-জাগরণ করতে গিয়ে চাঁইবুড়ো দেখেন—পুঁথি ঘুরে শুয়েছেন, উত্তর শিয়র থেকে দক্ষিণ শিয়রে। "কপিল কপিল" বলতে বলতে পুঁথিকে যথাবিধি জাগরণ, প্রক্ষালন,

দন্তধাবন, শিখাবন্ধন, তিলকসেবা, বস্ত্রপরিধান ইত্যাদি এবং এক চোখ বুজে এক তারা দর্শন করিয়ে চাঁইবুড়ো কাঁপতে কাঁপতে পুঁথিকে পেঁপেতলায় উপস্থিত করলেন।…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৯-২০

সকাল-বিকেল পুঁথির ভোগের ব্যবস্থার কথা তো আগেই বলেছি—

সকালে সকালে বাল্যভোগ দিয়ে পুঁথিকে সভাস্থ করলেন চাঁইবুড়ো! ··

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩০

কিংবা—

পুঁথিকে বৈকালিক শীতল ভোগ দিয়ে পুনরায় কথা আরম্ভ হল।…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩৬

এ ব্যাপার নিত্যনৈমিত্তিক। কিন্তু ঘটনাচক্রে পুঁথির অংশ-বিশেষ বিনষ্ট হলে, মহা অনর্থ। ভোরবেলা উঠেই এর প্রতিবিধান বিধেয়—

২৭শে কার্তিক, ১৩ই নভেম্বর, ৪ঠা শাবান—খণ্ডিত পুঁথিকে ত্রিবেদীয় মতে পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব দিয়ে আরোগ্যস্নান করিয়ে পঞ্চগব্য শোধন—

এসব কৃত্যের পর আনুষঙ্গিক পূজানুষ্ঠানের একটা অংশ যখন শেষ হল, 'বেলা তখন আড়াই প্রহর।'

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৯

আবার পুঁথি পাঠ করতে ব'সে হঠাৎ এমন এক-একটা 'দৈব' বিভ্রাট ঘটে যা চাঁইবুড়োর মতো পরম নিষ্ঠাবান পাকা পুঁথি-পড়িয়ে ছাড়া অন্যের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য। চাঁইবুড়ো একদিন—

ব্যাসাসন গণ্ডূষাদি ক'রে তৃতীয় পল্লব উল্টে দেখেন, পুঁথির পাঠ বদলিয়ে "মারুতি কথ্যতে" এর স্থানে কে যেন লিখেছেন—"জাম্বুড়ী বদতি"। চাঁইবুড়োর আপাদমস্তক শিহরিত। হৃদয়ে দশবার—ক্রোঁ, দক্ষিণ বাম চক্ষু, দক্ষিণ বাম কর্ণ দশবার স্পর্শ ক'রে—হ্রীং হ্রীং, দুই নাক টিপে হুঁ হুঁ দশবার, নিশ্বাস টেনে আর ছেড়ে ভ্রূর মাঝে 'ম্লুং' বলে তিনটি টোকা দিয়ে চাঁইবুড়ো বল্লেন—"পুঁথির পাঠ জাম্বুবান বদলিয়ে গেছেন। অতএব বক্তার ভুলচুক মাপ্—"

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২০

এরকম আরো বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তার দরকার

নেই। এসব হল পুঁথিপাঠের বিধি-বিধান, পুঁথির শুচিতা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপের কথা। এবার দেখা যাক পুঁথির সর্বাঙ্গে মধ্যযুগীয় প্রাচীনত্বের ছাপটি ভাষারীতি ও রচনাভঙ্গির মাধ্যমে কীভাবে মুদ্রিত করা হয়েছে।

৮

পুঁথির একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যযুগীয় ভাষা ও লৌকিক রচনা-ভঙ্গি। কথক-ঠাকুরের রচনা গদ্যে পদ্যে মেশানো। কথাগুলিতে রসিয়ে রসিয়ে ডালপালা ছড়িয়ে গল্প বলার ঢঙ। ভাষা কোথাও সরল, কোথাও সংস্কৃত শব্দবহুল, কোথাও 'গুরু-চণ্ডালি' – তৎসম, তদ্ভব, দিশি ও আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রণ। পদ্যের ছন্দোরীতি প্রধানত বিশিষ্ট কলামাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত), মাঝে মাঝে দলমাত্রিক (স্বরবৃত্ত)। আর ছন্দোবন্ধ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঢিলে-ঢালা পয়ার, ছিটেফোঁটা ত্রিপদী, কখনো-বা লয়-ভাঙা পয়ারে খানিকটা মুক্তকের আদল। কাহিনী এগিয়ে চলে গদ্যে পদ্যে হাত ধরা-ধরি ক'রে। কাহিনী পরিবেশনের ফাঁকে-ফাঁকে এসে পড়ে নানা প্রাসঙ্গিক-অর্ধপ্রাসঙ্গিক কথা। পদ্যের সঙ্গে এসে পড়ে কোথাও একটি আখর, কোথাও একটুখানি গায়েনের ঢঙ, কোথাও-বা জুড়ির টান। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় পুঁথির এই শিল্পগত বৈশিষ্ট্যগুলি চোখ খুলতেই ধরা পড়ে। বরং বলতে পারি এসব ব্যাপারে সাধারণ কথক-পাঠককে বহুদূরে ছাড়িয়ে গিয়েছেন তাঁর চাঁইবুড়ো। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের বক্তব্য বিশদ করা যাক।

পুঁথির পাঠ আর ব্যাখ্যা তো সহজ কর্ম নয়। বিশেষ করে সেটা যদি হয় 'পোড়ালঙ্কার পুঁথি' কিংবা 'মারুতির পুঁথি'। প্রথমটির কথাই ধরা যাক। রামায়ণে রাক্ষস-রাক্ষসী, বানর-বানরী ও দেব-দেবীর সম্ভব-অসম্ভব কাণ্ড-কারখানার কি শেষ আছে? কত অসংখ্য রটনা-ঘটনা, দুর্ঘটনা, কতই না অঘটন-ঘটন! এই তো দৈব-দুর্বিপাকে বিপন্ন রাক্ষসেরা আত্মরক্ষার জন্যে মাটির ভিতরে সুড়ঙ্গ কেটে সমুদ্রের তলা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে—

উপরে অসাগর জল টলমল করে;
তল দিয়া নিশাচর দল বলে চলে

—চাঁইবুড়োর পুঁথি পৃ ৭৫

কিন্তু আর-সবাই তো সুড়ঙ্গ দিয়ে সুড়সুড় ক'রে পালাচ্ছে, কী উপায় করে কুম্ভকর্ণের বউ? ছ'মাসের আগে তো ঘুমই ভাঙবে না কুম্ভকর্ণের। স্বামীকে বিপদের মুখে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে কী ক'রে যাবে সে? আপৎকালে লোক-লজ্জার কোনো মানে হয় না। অগত্যা—

কাঁখে কুম্ভকর্ণ মাথায় খাটিয়া
বউ চলেছেন যেন হাওদা পিঠে রাজ-হস্তিনী
সুড়ঙ্গ পথে হাঁটিয়া
সমুদ্রের তলা দিয়া পথ কাটিয়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৫

তার আগে আগে অন্য-সব নিশাচরও আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে সারবন্দী হয়ে চলেছে—

প্রকাণ্ড যেন সাপ
পাতাল বাগে চল্লো আঁকিয়া বাঁকিয়া।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৫

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপরের উদ্ধৃতি তিনটির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির বর্ণনা অদ্ভুত রসাশ্রিত,—আর হাস্যরস উদ্রেকের পক্ষে দ্বিতীয়টির প্রথম পংক্তিই যথেষ্ট, যদিও পরবর্তী উৎপ্রেক্ষাটি তারই রাজকীয় সংস্করণ। সামগ্রিকভাবে হাস্যরসই হচ্ছে সমস্ত ছবিটার অঙ্গিরস। ছন্দের বিচারে সবগুলি উদ্ধৃতিই বিশিষ্ট কলামাত্রিক (অক্ষরবৃত্ত) রীতির, ছন্দোবন্ধ— প্রথম উদ্ধৃতিটি ঢিলে পয়ার, শেষ দুটিতে তাও ভেঙে সাতখানা, খানিকটা অনিয়ন্ত্রিত মুক্তকের আদল। আর ভাষার কথা কী বলব? আমাদের হাতে রচনা শুধরোবার ভার পড়লে প্রথম উদ্ধৃতির 'অসাগর' কথার আদ্য 'অ'-টাকে গোড়াতেই দিতাম সরিয়ে। তাতে ভাষাটাও ভব্য হত, ছন্দটাও রক্ষা পেত। এ-ছাড়া 'দলে বলে'-র বদলে লিখতাম 'দলে দলে'—তাতে শোনাত ভালো। কিন্তু এর ফলে ক্ষতি যা হত তা অপূরণীয়, কেননা আমরা পুঁথির আসল বস্তুটাই হারাতাম—তার প্রাচীনগন্ধী স্বাদ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতির 'রাজ-হস্তিনী' 'সমুদ্রের' 'প্রকাণ্ড' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে 'কাঁখে' 'খাটিয়া' 'পাতাল-বাগে' প্রভৃতির 'গুরু-চণ্ডালি' যোগটি কাটাতে গেলেও ফল হত একই।

ধরা যাক আরো একটা দৃষ্টান্ত। রাবণ দূর থেকে দুরুদুরু বুকে বালি-কে দেখছে—

উভলেজ পরশিছে গগনমণ্ডল
নিম্নে তার বালি মহাবল,
যেন আর এক আখণ্ডল।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩৭

এখানে 'উভলেজ' কথাটি লক্ষণীয়। শব্দটি আজকাল অচল। সাম্প্রতিক কালে 'উল্লাঙ্গুল' বলে একটা কথা চালু আছে। অর্থের দিক থেকে যা-ই হোক, দ্যোতনার দিক থেকে তা স্বতন্ত্র। বস্তুত ছবি হিসেবে উপরের বর্ণনাটি চমৎকার। দূর থেকে উপরের দিকে চেয়ে সব-কিছুর আগে রাবণের চোখে পড়ছে বালির ঊর্ধ্বায়িত আকাশস্পর্শী দীর্ঘ লেজ, তারপর চোখ নামিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে ভূপৃষ্ঠে বালির অতিকায় দেহটাকে। এখানে 'গগনমণ্ডল' 'আখণ্ডল' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে 'উভলেজ' কথাটির সম্পর্ক যতই 'গুরুচণ্ডালি' হোক, সব মিলিয়ে রচনাটি যেমন সার্থক তেমনি মধ্যযুগের ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত এভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। তাই আপাতত অবনীন্দ্রনাথের পুঁথিগুলি থেকে নানা ধরণের কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। পাঠক নিজেই এদের যথাযোগ্য উৎকর্ষ বিচার করবেন, এবং অবনীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনুরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আহরণ করবেন।

পুঁথির পাতায় পাতায় হাস্যরসের বিচিত্র উপাদান যদৃচ্ছা ছড়ানো। প্রখর রৌদ্রে সীতার ব্যর্থ অন্বেষণে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধিত, তৃষ্ণার্ত, শ্রান্ত জাম্ববান আর বানরদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। জাম্ববান বলছে—

·· এসে পড়া গেছে এমন দেশ
যেথা'নে কিছুর নাই উদ্দেশ
ভুঁই আছে বটে—গাছপালা শূন্য
পুঁই শাকও নাই – কি করো অন্য।
গণা করি এটা মহাদেশ নয়—
মহা নিরুদ্দেশ।

'মরিয়া হয়ে' সকল বানর অশান্তভাবে ছটফট করছে —

' উঃ শরীরেতে নাই ঘর্মলেশ
হয়ে আসছে কর্ম শেষ !
চর্ম পুড়ছে ঘর্ম ঝরছে না
লোল জিহ্বা জল ক্ষরছে না !

ক্ষুধা গেছে উঠি ব্রহ্মরন্ধ্র তক্
তৃষ্ণা পৌঁছেছে যেথা ল্যাজের নখ্।

—মারুতির পুঁথি পৃ ৭১

এখানে বর্ণনাভঙ্গি তো বটেই, এমন-কি অনুপ্রাসের আতিশয্যটাও কম উপভোগ্য নয়। প্রথম উদ্ধৃতিতে 'দেশ' 'উদ্দেশ' মহাদেশ" 'মহা নিরুদ্দেশ' কিংবা 'ভুঁই' 'পুঁই' এবং দ্বিতীয়টিতে 'ঘর্ম' 'কর্ম' 'চর্ম'—কথাগুলি এমন-ভাবে বসেছে যে পড়তে-না-পড়তেই হাসি পায়। মধ্যযুগের শেষে এবং আধুনিক যুগের শুরুতে আমাদের কবিওয়ালারাও হঠাৎ-হঠাৎ এমনি অনুপ্রাসের নেশায় মেতে উঠতেন। কিন্তু যাক সেকথা। এদিকে আবার অন্তিম পংক্তি দুটিও কম হাস্যকর নয়। 'ব্রহ্মরন্ধ্র তক্' অদ্ভুত রকমে গুরুচণ্ডালি, আর 'যেথা ল্যাজের নখ্' অবিশ্বাস্য রকমে উদ্ভট।

যা হোক, উপাখ্যানের যে-অংশটা ধরেছি তা শেষ করি। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর জাম্ববান আর বানরদের এই মর্মান্তিক অবস্থা দৃষ্টে সুবিজ্ঞ সুষেণ বৈদ্য মহা চিন্তাগ্রস্ত। এর প্রতিকার কী? বহুক্ষণ ধ'রে অনেক ভেবে-চিন্তে সর্বশেষে তিনি তাঁর বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপত্র দিয়ে মুশকিল-আসান করলেন—

আহার নাই যখন
অনাহারে যে কয়দিন করা যাক লঙ্ঘন।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭১

বিলক্ষণ! স্বয়ং বৈদ্যশ্রেষ্ঠ সুষেণ যখন 'লঙ্ঘনে'র ব্যবস্থা দিয়ে এত বড়ো একটা সমস্যার এমন সহজ সমাধান করে দিলেন, তখন আর কথা কী? তাঁর মতো প্রাজ্ঞ আর কে আছে? 'রোগ-নিদান' থেকে 'মৃত্যু-লক্ষণ' পর্যন্ত সমস্তই তাঁর নখাগ্রে। এই তো তৃষ্ণায় উপবাসে কাতর সুগ্রীবের জামাতা 'তাই তাই' বুঝতেই পারছে না তার কী হয়েছে। তার 'লেগেছে দাঁতে দাঁত' ঠাহর করতে পারছে না 'মরণ আসবে কতক্ষণে'। জাম্ববান তার কথা শুধোয় সুষেণ বৈদ্যকে—

দেখ তো, ঘুম এসতেছে না যম এসতেছে?

সঙ্গে-সঙ্গে সুষেণ স্পষ্টই বলে দিলেন—

নেত্র মুদিলেই কি হয় মরণ?
শিবনেত্র হোক আগে
নাকটা বাঁকুক বাম ভাগে ··

তারপর এমন একটা সময় আসুক, যখন—

বিছার কামড়ে অনড় রবে
ল্যাজ নড়বে না কাটিলে ভাঁশ
হাঁচি আসবে না নাকে দিলে নাস…
তবে জানবো এল মরণ।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৩-৭৪

কী যে সব অর্বাচীনের দল! মিছিমিছি ঘুমে যমে গোল করে ফেলে!

সমস্যা ব'লে সমস্যা! পুঁথির আগাগোড়াই তো সমস্যা। মারুতির পুঁথির শুরুতেই তো এমন একটা গিঁঠ লেগে গিয়েছিল যে রামলীলা হয় কি না হয়। শ্রীরামের সহায়তার জন্যে দেবতারা সব বানররূপী হয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় অবতীর্ণ। তাঁদের আর-সকলের উদ্বাহকার্যও যথারীতি সম্পন্ন হল, কিন্তু কোথায় পবনদেব? পবনের বিয়ে না হলে কোথা থেকে আসবে হনুমান? আর হনুমান ছাড়া রামায়ণ হয়? কিন্তু কে পাবে পবনের হদিস?—

পবনদেব উনপঞ্চাশ সহচর সঙ্গে রামকার্যের জন্য মনোমত একটি ঘরণীর চেষ্টায় ধরণী পরিভ্রমণ করছেন।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২১

কেউ বলতেই পারছে না এখন কোথায় তিনি। লোহিত সাগরের রোহিত মৎস্য-বাহিনী গুর্জিন্ সুন্দরীকে দেখে—"বরুণ দাদারই পোষায় এ মেয়ে"—বলে পবন হয়েছিলেন উত্তরমুখো। সেখানে—

শ্বেত ভালুকীর পরে শ্বেতদ্বীপের কন্যা
কি কবো তাহার রূপ—বরফের যেন বন্যা।
জানি না, পবনদেব পড়লেন তার পাকে
অথবা পবনের পাকে পড়ল কি না সে কন্যা!

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২২

ইন্দ্রপুরে হাওয়া মহলের চূড়ার পরে বাজ-কাটিতে বসে থাকা শ্বেতকাককে ইন্দ্র শুধোলেন—

"পবন এখন কোন্ মুখে বইছেন?"

শ্বেতকাক চেয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম মুখে, যেন ঘূর্ণি হাওয়াতে ফেরালে মুখ দক্ষিণে।

"কিছু বুঝলেম না।" বলে ইন্দ্র উঠলেন।

ইন্দ্রানী বললেন—"আর বুঝে কি হবে? পবনের মতিগতিই ঐ প্রকারের। উতলা হয়ে ঘুরুন এখন দশদিকে!"

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২২

—এক কথায়, সবাই ছেড়ে দিয়েছে হাল,—রইল পড়ে 'রামকার্য'। এরকম বিপদের সময়ে চাঁইবুড়োর মতো হুঁশিয়ার কাণ্ডারী না হলে এইখানেই হয়ে যেত মারুতির পুঁথির ভরাডুবি। তারপর কতরকম পাকচক্র করে শেষ পর্যন্ত তিনি পবনকে এনে মিলিয়ে দিলেন অঞ্জনার সঙ্গে। তবে তো সম্ভব হল হনুমানের আবির্ভাব!

অবশ্য বিয়ের ব্যাপার মাত্রই ঝামেলা। কেবল গিঁঠ আর গিঁঠ। বলতে বলতেই মনে পড়ছে আরো-একটা বিয়ের কথা। সেটা চাঁইবুড়োর স্বনামে লেখা পুঁথির কাহিনী। এখানে বিয়ে করতে চাইছে রাবণের বোন শূর্পণখা। দাদারা বিয়ে ক'রে গিন্নি এনেছে। সেও আনতে চায় একটি 'ছোট কর্তা'। ইচ্ছেটা প্রকাশ করে মামা কালনেমির কাছে। কালনেমি ভাগ্‌নীকে বলে, ও ছেলেধরার মতলবে আছে কিন্তু তা হবার জো নেই, কেননা ওর বাপ 'বেম্মোষি' পালিয়েছে—কন্যাদান করবে কে? শূর্পণখাও ছাড়বার মেয়ে নয়, বলে, 'তুমিই তো কন্যাদান করতে পার, তাতে আটকাচ্ছে কোথায়?' কোথায় যে আটকাচ্ছে সুচতুর কালনেমি তা ভালো ক'রেই জানে। ভাগ্‌নীকে স্পষ্ট বলে দেয়, মামা-ভাত দিয়েই সে তার কাজ চুকিয়েছে। কন্যাদান তার কর্ম নয়, এতে ঝক্কি আছে—

দিতে হয় কন্যাটি সালংকারা, ভরি দরে যাচাই,
তদুপরি আছে দান-সামিগ্রি,
বাসন কোসন, খাট পালং
আর্সি তিনপাট্, আরো কত কী…
নজরানা বরের হীরার আংটি…
টাকা পয়সার মুক্তধারা বইয়ে দেওয়া চাই
এত অর্থ সামর্থ্য মামার তোমার নাই!

—চাঁইবুড়োর পুঁথি পৃ ১৩

—একেবারে সাফ্ কথা। এর থেকে কালনেমি আর এক ইঞ্চিও নড়ছে না। এখন উপায়? উপায় একমাত্র চাঁইবুড়ো। বুদ্ধি করে শূর্পণখার মুখে বসিয়ে দিলেন মাত্র একটি কথা—

কাজ নেই মামা, আমি ছয়ম্বরা হব
তাতে তো খরচ নেই।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৪

একেই বলে মুশকিল-আসান! খরচ আবার কী? 'একগাছা মালা, আর ঢ্যাটরা যে পিটবে তাকে কিছু হাতখরচ।' 'এটুকু তোমার দিতেই হবে মামা, জানো তো আমার বিয়ে দেবার আর কেউ নেই'—শূর্পণখার কণ্ঠে মিষ্টি মিনতির সুর। 'বামুনের মেয়ে ধরেছে', কী আর করা যায়? কলেনেমির গিন্নিও বললে, "তাতে দোষ কি?—

শেয়াল হোয়া দিলে বেড়ালে মেও ধরলে,
ছুঁচোয় করলে কীর্তন।
বিয়ে করলে দাদা তিনজন
এটুকুও হয়ে যাক্—মন্তব্যে কি প্রয়োজন?"

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৪

আমরাও নিশ্চয়ই কোনো মন্তব্য করব না। বিয়ের পর যা-ই হোক, পোড়ালঙ্কার পুঁথিটা যে একটা কঠিন ঘাট পেরুল, এই যথেষ্ট।

ভাষা-সংকরের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে কুম্ভীনসী হরণের কথা পূর্বের অধ্যায়ে একটু-খানি বলেছি। কিন্তু ব্যাপারটা গড়িয়েছে বহুদূর। ক্রুদ্ধ রাবণের হুংকার আর তার প্রতিক্রিয়ায় একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গিয়েছে লঙ্কাপুরীতে। 'কুম্ভীনসী'র খবর আসতে যতই বিলম্ব হয় রাবণ ততই অস্থির হয়ে ওঠেন, আর একে ওকে তাকে 'তম্বি তাম্বা ধমক ধামক' করেন।—

ল্যাও কুম্ভীনসী—কাঁহা কুম্ভীনসী?
যত বাহ্বাস্ফোট তত দাপট।
চোটপাটের চোটে
দ্যালের গায়ে ফোস্কা ওঠে
থাম্বাগুলোতে আম্বাতে…
শালের খোঁটাগুলোর খোঁতামুখ ভোঁতা,
মেঝেয় ওঠে চটা
কথার দাপটে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪২

রাবণের দাবড়িতে হাঁড়ির রাবড়ি হয়ে গেল শোন্‌পাপড়ি, ক্ষীর হয়ে গেল পাতলী, দধি হয়ে গেল ঘোল, আর ঘোল হয়ে গেল ঘৃতের খাঁকড়ি।

এদিকে ল্যাও ল্যাও শব্দ! কে যে কি নিয়ে আসে ভেবে পায় না। কেউ আনে কুম্ভ, কেউ আনে জালা, কেউ আনে কলসী, আবার কেউ-বা নম্বি এনে হাজির করে। লাথির চোটে কুম্ভ ফাটে, কুঁজো গড়ায়, জালা ফোটে, কলসী ভাঙে—কুম্ভীনসী কে, কি বৃত্তান্ত, কেউ জানে না।

কুম্ভীনসী কে তা জানবার প্রয়োজন কী? লঙ্কায় ভূমিকম্প হচ্ছে—এটা জানলেই হল। ওদিকে—

দেউড়িতে দ্বারপাল ভিন্দিপাল চেঁচায়—ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া শব্দে—যেন একপাল শেয়াল জমায়েত করছে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪২

এমনি করে সারা পুঁথি জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র কাহিনী, তার থেকে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করা গেল। সব শেষে আরো দুয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। মঙ্গলকাব্যে আছে 'বারমাস্যা', আর চাঁইবুড়োর পুঁথিতে আছে 'বিরহীর বারবেলা'। চার শনিবার পূর্বে মহোদর গিয়েছে ঘর থেকে, আজও ফেরবার নাম নেই। আবার এসেছে শনিবার। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, বিজলীর ছটা, বিষ্টি নামে-নামে। মহোদরী গাইতে লেগেছে বিরহীর বারবেলা—

উত্তরেতে কলাগাছ দক্ষিণেতে পুঁই
একলা ঘরে কালো বিড়াল, কি করব মুই।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯০

আবার ছড়ার প্রসঙ্গ আলোচনা কালে যে 'ঘটি চালার মন্তর' উদ্ধৃত করেছি সেটিও নেওয়া হয়েছে এই পুঁথি থেকেই। এছাড়া আগেই বলেছি, কথক ঠাকুরের গলায় কখনো শোনা যায় গায়েনের সুর, সেই সঙ্গে জুড়ি-দোহারের টান। সীতার অন্বেষণ করতে করতে রাম লক্ষ্মণ আসছেন পম্পাতীর দিয়ে। সুগ্রীব গবাক্ষকে বললেন—

কে আসিছে দুই জনা পম্পাপথ বাহি
অক্ষি খুলি গবাক্ষ দেখ দেখি চাহি…

গবাক্ষ চক্ষু পিটপিট করে দেখে বল্লেন—

"আজানুলম্বিত বাহু"—

গয় অমনি স্বর ধরলে—

"উউ উউ উউ উ..."

—"করিশুণ্ড কদলীকাণ্ড করযুগ উরু"

—"উরু—রু রু রু..."

—"ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ, ছন্দ ছাঁদ শাল কিংবা তাল তরু।

—মারুতির পুঁথি পৃ ৫৩

গবাক্ষ সুর করে গাইছে কথাগুলো, আর গয় রেশটুকু টেনে রেখেছে জুড়ির মতো।

৯

পুঁথির আলোচনা শেষ করবার আগে পুঁথির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আবার একটুখানি স্মরণ করাতে চাই। গোড়াতেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের এসব রচনা আকারে পুঁথি হলেও প্রকারে প্রহসন—অর্থাৎ এগুলি নূতন কিছু। এ যেন পুরনো পাত্রে নূতন সুরা। যেহেতু রসের ভিয়ান আধুনিক সেই কারণে ভাষার প্রাচীনত্বের উপরে ঝোঁকটা পড়েছে আরো বেশি। এবার তারই কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথমে দেখা যাক শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ—

পঞ্চনবতি যোজন মেলাই আমি পাখা (মা-পুঁ ৯৮)

কুপ্যায়িত হয়েছে বৈমাত্রিক নিশাচর (চাঁ-পুঁ ৭৭)

উদয়তি যদি ভানু পচ্চিমে দিবাভাগে (চাঁ-পুঁ ৬৮)

অতঃপরং কিং কর্তব্য—বুঝে কন্ উপায় (মা-পুঁ ৭০)

ন ভূতে ন ভবিষ্যতে রাক্ষসে খোক্কসে লাগে (চাঁ-পুঁ ৬০)

ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎ ব্যোম্ যমে ডরায় চৌদ্দ ভুবন (চাঁ-পুঁ ৫৮)

অলমিতি বিস্তরেণ—হল রন্ধ্রগত শনি (মা-পুঁ ৮৪)

নাস্তি ধর্ম কুতো সত্য অস্তি কেবল নৃশংসতা (মা-পুঁ ৯৪)।

তাছাড়া তৎসম, তদ্ভব, দিশি প্রভৃতি শব্দের লৌকিক ঢঙের মিশ্রণ—

জগৎপিতার বে (মা-পুঁ ১৬)

সোনা বান্ধা সরোবর (চাঁ-পুঁ ৭৩)

নখেতে পাষাণ ফাড়ি (মা-পুঁ ৪২)

পোড়া কাষ্ঠবৎ দেহ অসান (মা-পুঁ ৬৫)
প্রাণ বাঁচায়ে লাঙ্গুল গুটাইও (মা-পুঁ ৫৭)
দুই হস্তী লড়ে যেন দন্তে হানাহানি (চাঁ-পুঁ ২৫)
উঠিয়াছে এক মুর্চা ভেদিতে গগন (মা-পুঁ ৪০)
অনাবৃষ্টি হেতুক বৃক্ষেতে নাই ফল (চাঁ-পুঁ ৮৮)
তাজা বেতাজা রক্ষরাজের ফৌজ লড়ে (চাঁ-পুঁ ৭৯)
বেলা অবসান প্রায় অস্ত যায় ভানু
…কিষ্কিন্ধ্যায় আনু (মা-পুঁ ৩২)

আর পুঁথি মাত্রই বিকৃত ও অশুদ্ধ শব্দের আকর বিশেষ—

বিধাতার অবিচারে লোকে হয় দুরু (মা-পুঁ ৮)
কান্‌তে কান্‌তে কপালে কর হানে (মা-পুঁ ২৩)
পালাতে না পেরে হইল ফাঁপর (মা-পুঁ ২৭)
ওরে বাছা ইকি শুনি বোল ? (মা-পুঁ ৩০)
ইন্দ্র বলেন—শরীর হোক বজ্রের সোসর (মা-পুঁ ২৯)
ভুর্না হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন (মা-পুঁ ৪৬)
তেলাপোকা রূপে আসি সান্ধাইল ঘর (মা-পুঁ ৪৮)
এক লম্ফে উঠে শিশু দেখিতে ভুঙ্কর (মা-পুঁ ২৭)
ঋষ্যমুখে হনুমান হঠাৎ মুচ্ছিত (চাঁ-পুঁ ৩)

এ ছাড়া লোকমনোরঞ্জনের জন্যে অনুপ্রাস বা শব্দসাদৃশ্য তো একটা মোক্ষম উপকরণ—

ঋষি ছিল না বুঝি একটা অদ্‌ভুৎ (চাঁ-পুঁ ৯)
টংকারেতে ধনুষ্টঙ্কার লঙ্কার রাবণের (চাঁ-পুঁ ৯৪)
গঞ্জ ছেড়ে দে দৌড় গাঙ্গা মেরে লাফ্‌ (চাঁ-পুঁ ১৫)
তাম্বাক, তম্বাক, গুরুক্‌, চুরুট্‌ (চাঁ-পুঁ ১৪)
বাবুইবাসা-বিবিয়ানা-খোঁপা (চাঁ-পুঁ ১৫)
কর্তা না ভর্তা (চাঁ-পুঁ ১২)
পিরীত ভোজ পেরেত ভোজ (চাঁ-পুঁ ১৩)
এসো না পিঠাপিঠিতে মিলি
পিটাপিটিতে কাজ কি ভাই (চাঁ-পুঁ ৩৫)

খিড়কীদোরের খড়কি সিং (চাঁ-পুঁ ৪২)
রাজবয়স্য ক্ষুরুপাস্য
সদা মৃদুমন্দ হাস্য (চাঁ-পুঁ ৪৩)
সিংহল হতে সিংভূম
মগরা হতে মথুরা (চাঁ-পুঁ ৪৫)
চটি চট্‌পটে, কোঁচা লটপটে (মা-পুঁ ১৮)
আকটা বিকটা · এক জটা হরিজটা
সব কটা চেড়িতে (চাঁ-পুঁ ১০)
তিমিরে তিমি তিমিঙ্গিল (চাঁ-পুঁ ১৬)
আগে কথা কাটাকাটি
পরে লাঠালাঠি (চাঁ-পুঁ ১৩)
বড়ই বঞ্চক তঞ্চক ঐ জন (মা-পুঁ ৭৯)
হয় লয়, নয় প্রলয়, নয় প্রণয় (মা-পুঁ ২১)
পতঙ্গ রূপ ছেড়ে প্লবঙ্গের মতো লাফিয়ে (মা-পুঁ ৬৫)
লম্পটি ঝম্পটি খেয়ে হিম অঙ্গ হনুমান (মা-পুঁ ৫৮)

যাক্, আর দরকার নেই।

পুঁথির একটা বড়ো সম্পদ প্রাজ্ঞোক্তি। অবনীন্দ্রনাথ সেদিকেও দৃষ্টি রেখেছেন। মারুতির পুঁথিতে দেখছি—

নাক কাটিলে কাঁদিতে রসা
কাটা ঘায়ে যেন লবণ ঘসা
কান কাটিলে চুলে ঢাকা যায়
চোখের জল সে কাটা নাক জ্বালায়। —পৃ ৪৪

যুগ্যতা থাকে তো অসম্ভব কও
তদভাবে যথাসম্ভব ওষ্ঠ বন্ধ রও। —পৃ ৪৯

বহু দোষ জন্মে অতি লালনে
বহু গুণ বর্তে গুরু তাড়নে। —পৃ ৪৩

ধন থাকিলে বিরোধ বাধে শুন মহাশয়
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ধনলোভে হয়। —পৃ ৮৫

যদি রয় স্ববৃক্ষ একটি স্থগন্ধে পুষ্পিত
সর্বজন তার গন্ধে হয় আমোদিত। —পৃ ৩০

কিংবা চাঁইবুড়োর পুঁথিতে—

কারু মন্দ না করেন চন্দ্র, করেন সবার হিত।
হেন চন্দ্রে হিংসা করা তোমার অনুচিত। —পৃ ৬৭

ভক্তি মাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ। —পৃ ৭

অবিবাদ বিসম্বাদ ভেজায় নারদ,
নারদ যাহাতে যায় ঘটায় আপদ। —পৃ ৬৯

ছোট জিনে বড় জিনি এই পরিপাটি
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুষেতে ঘাটি। —পৃ ৭১

মানবের মান গুম্ফে আর কর্ণমূলে
বানরের মান লম্ফে আর লাঙ্গুলে। —পৃ ১

স্বপনে পাই সোনার ঘড়া
জাগরণে নেই একটি কানা কড়া। —পৃ ৮৩

পুঁথির কথা অনেক হল। এবার যাই পালাগানে।

১০

অবনীন্দ্রনাথের পালাগানগুলি তাঁর পুঁথির মতোই হাস্যরসের আধার। শুধু পুঁথি-পালাগান কেন, তাঁর বৈঠকী গল্পগুলিও তাই। এসব রচনায় শ্রোতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে নির্মল হাস্যকৌতুক করাই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর ব্যঙ্গগুলিও তাই শুভ্রহাস্যে সমুজ্জ্বল। এই বিভিন্ন ধরণের রচনায় প্রভেদ যত-না প্রকৃতিগত তার চেয়ে ঢের বেশি বাইরের চেহারায়। হংসনামা, এসপার ওসপার, সিন্ধবাদ বিবরণ পত্র, শিব-সদাগর, ধরা পড়া জাতীয় পালাগানে

এসেছে বেশ খানিকটা পুঁথির আদল, আবার 'চাঁইবুড়োর গল্প', 'সিকস্তি পয়স্তি কথা', 'রতনমালার বিয়ে', 'ভবের হাটে হেতি হোতি', 'একে তিন তিনে এক' প্রভৃতি বৈঠকী গল্পগুলি যেন পুঁথি আর পালাগানের মাঝখানে থমকে আছে; একটু ভোল পাল্‌টালেই এরা যে-কোনো একটা দলে ভিড়তে পারে।

তা হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গলক্ষণ একটা বড়ো কথা। তাঁর পালাগানগুলি পুঁথির মতো ছদ্মবেশে নয়, স্বরূপেই প্রহসন—খাঁটি কৌতুকনাট্য। তবে যে-হেতু এরা যাত্রা-ধর্মী—এবং এদের রচনাভঙ্গিতে রয়েছে প্রাচীন তথা অধুনা-পূর্ব যাত্রা-রীতি—তাই অনেকগুলি পালাগানে ছড়িয়ে আছে পুরনো ঢঙের পয়ার-পাঁচালী, ছড়া আর গান। ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পালাগান থেকে নেওয়া কিছু-কিছু ছড়া উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছি। আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারত। তাঁর 'ফসকানো পালা' বলতে গেলে সবটাই তো ছড়ার মালা। তেমনি পাঁচালীর উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায় 'সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য'র প্রায় গোটা রচনাটাই। এতে গায়েন, তুড়ি-জুড়ি, সিন্ধবাদ, খালাসি, কাঠুরিয়া প্রভৃতির মুখে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় যে পয়ারবন্ধ বসানো হয়েছে তার ঢঙটা হুবহু আঞ্চলিক পাঁচালীগানের।

মৌলিকতার প্রশ্নে বলা যায়, তাঁর পুঁথিগুলি যেমন পুরাণ-মহাকাব্যকে নাম মাত্র ছুঁয়ে সবটাই তাঁর স্বকীয় কল্পনা, পালাগানগুলিও তেমনি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি—কতকগুলিতে পুরাণ-মহাকাব্য, বাইবেল, আরব্য উপন্যাস, ঈশপের গল্প কিংবা লৌকিক কেচ্ছা-কাহিনীর একটু-আধটু ছোঁওয়া লেগেছে মাত্র। 'হংসনামা'য় শ্রীকৃষ্ণ, ভীম-হিড়িম্বা প্রভৃতি চরিত্র নামে মাত্র মহাকাব্যের। 'এসপার ওসপারে' নহুষের নামটাই বা আছে কেন? 'নোয়ার কিস্তি'তে বাইবেলের কাহিনীর আদল কতটুকু রাখা হয়েছে? 'সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্যে' নায়কের নাম ছাড়া আর সবটাই অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা। এদিকে 'শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল' গল্প অবলম্বনে রচিত 'ফসকানো পালা' কিংবা ঈশপের গল্প-ভিত্তিক 'বৃক ও মেষ পালা' আগাগোড়াই ঢেলে সাজানো। 'ভূতপত্‌রীর যাত্রা' তাঁর নিজেরই ভূতুড়ে গল্পের আরো কিম্ভূত নাট্যরূপ, আর 'লম্বকর্ণ পালা'য় রাজশেখর বসুর গল্পের উপরে রঙ চড়েছে কত পোঁছ? এছাড়া 'কঞ্জুষের পালা', 'বেণুকুঞ্জের পালা', 'মউর ছালের পালা', 'কথামালার সঙ পালা' প্রভৃতি তো বলতে গেলে আগাগোড়াই তাঁর সৃষ্টি। বস্তুত প্রত্যেকটি পালাই তাঁর স্বকীয়তার

স্বাক্ষর বহন করছে। সর্বোপরি তাঁর সবগুলি পালার নাট্যপরিকল্পনায় তিনিই তো একমাত্র কবি-প্রজাপতি!

১১

অবনীন্দ্রনাথের পুঁথি ও পালাগানের মিল ও অমিলের কথা একটু আগেই বলেছি, এবং এদের অমিলটা যে আসলে শিল্পলক্ষণগত তাও উল্লেখ করেছি। যত এলোমেলোভাবেই বলা হোক, পুঁথির বিভিন্ন অংশের আখ্যানের স্বকীয় এক-একটি কাহিনীসূত্র আছে। 'পোড়ালঙ্কার পুঁথি'র অংশ-বিশেষ পুড়ে গিয়ে থাকলেও একথা সত্য। এর কারণ পুঁথি মুখ্যত আখ্যানকেন্দ্রিক এবং তার প্রধান অবলম্বন শ্রুতিচেতনা—কথকঠাকুর মুখে গল্প ব'লে চলেছেন 'সুতার' ক'রে, আর কৌতূহলী শ্রোতারা নিবিষ্ট চিত্তে শুনে যাচ্ছে কান পেতে। কিন্তু যতই 'গান' বলা হোক, পালাগানের আসল বস্তুটি হল তার নাট্যগুণ। তা মুখ্যত চরিত্র ও ঘটনা-কেন্দ্রিক। তার পূর্ণরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় দৃশ্যপরম্পরায়। এই কারণে তা দৃষ্টিচেতনার ইঙ্গিতবাহী, যা সার্থক হয়ে ওঠে অভিনয়ে। আমরা আশা করি পালার চরিত্রগুলি আসরে এসে চ'লে বেড়াবে আর ঘটনাগুলো ঘটতে থাকবে সকলের চোখের উপরে। পালাটি হাস্যরসাত্মক হলে তার চরিত্রগুলো হয় অদ্ভুত,—তাদের কথাবার্তা উদ্ভট, আচার-আচরণ খাপছাড়া, অনেক সময় তাদের আবির্ভাব-অন্তর্ধানেও থাকে না কোনো কার্য-কারণগত সংগতি। তারা দর্শকের সামনে হাজির হলে কাহিনীর কথা তখন আর কে ভাবে? কাহিনীকে এক পাশে ঠেলে রেখে তারা নিজেরাই আসর দখল ক'রে বসে,—আপন আপন খেয়াল খুশি মতো বলে, চলে, নাচে, গায়। ভাবটা যে, কাহিনী থাক, আমাদের দিকে তাকাও। তাই হাস্যরস উদ্রেকের ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের পালাগান তাঁর পুঁথিকেও ছাড়িয়ে গেছে—এখানে পুঁথির কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চরিত্রগুলোর খামখেয়ালিপনা।

এদিকে চরিত্রের সংখ্যা আর বৈচিত্র্য দুই-ই বিস্ময়কর। পুরাণ-মহাকাব্যের চরিত্র বাদ দিলেও মানুষই তো রয়েছে হরেক শ্রেণীর। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত থেকে শুরু করে পুলিশ, চোর, কঞ্চুষ, ভিখারি পর্যন্ত সকলেই এসে ভিড় করেছে পালাগানে। একদিকে আছে দেওয়ান, মুন্সি, খাতাঞ্চি, তো অন্যদিকে আছে দারোয়ান, পেয়াদা, চোপদার। গুরু, পুরুত, পাণ্ডা, গোঁসাই-

বাবাজি, সাধু—এরাও বাদ পড়েনি। ভাঁড় তো থাকবেই, সেই সঙ্গে জুটেছে চিত্রকর। আছে সদাগর, দালাল, মাঝিমাল্লা; আছে দর্জি, খানসামা, ময়রা; আছে মেছো, বেহারা, জলভিস্তি। কত আর বলব? চরিত্রগুলো আবার এক ভাষায় কথা কয় না, এক দেশের লোকও নয় তারা। বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া তো আছেই,—সেই সঙ্গে আছে ফিরিঙ্গি, কাবুলি, ইহুদি; আছে আরবদেশী বণিক। অথচ এতেও সবটুকু বলা হল না। বিশ্বাস করি আর না-ই করি, এ ছাড়াও রয়েছে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ—অর্থাৎ বাঘ-ভালুক, শেয়াল, ছাগল-ভেড়া, হুড়ুহুম্বা, কিংবা শুকপাখি, রালতাপাখি অথবা কোলাব্যাং, ঝিঁঝি, উইচিংড়ি। লতা-পাতারও সংলাপ আছে ছড়ার ছন্দে। আবার ঘোড়াও আছে নানান্ দেশের, তবে তারা সব প্রেতযোনি—ঘোড়াভূত। ভুতুড়ে কাঠের ঘোড়াও নাচে, গান করে, কথা কয়। এদিকে খবর-কাগজও একটা জ্যান্ত চরিত্র। এর পরে আর কথা চলে না। এই প্রাণী-অপ্রাণী, ইহলোক-পরলোকের এই বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির চরিত্রকে এক-এক পালায় এক-এক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন পালাকার অবনীন্দ্রনাথ। নিজে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন সাজ-ঘরে—কিংবা হয় তো মিশে আছেন দর্শকদেরই ভিড়ে—আর পালার প্রয়োজন বুঝে মাঝে-মাঝে পাঠাচ্ছেন তাঁর প্রতিনিধিদের: তারা কেউ অধিকারী,—সঙ্গে হর্তা-কর্তা; কেউ-বা গায়েন,—সঙ্গে তুড়ি-জুড়ি।

উপরের সবরকম উদাহরণ দিতে হলে পৃথক্ বই লিখতে হয়, তাই এখানে সামান্য দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ভূতপত্রীর যাত্রা'য় 'কেয়াতলার সাট'-এ ঘোড়া কেনার ব্যাপারে অবু, হার্সটন সাহেব, দালাল আর কাঠের ঘোড়ার কথাবার্তাগুলো শোনা যাক। অবশ্য মনে রাখতে হবে, এখানে অবু ছাড়া আর সবগুলো চরিত্রই ভুতুড়ে। পাল্‌কি না পেয়ে অবু অগত্যা ঘোড়া কেনাই স্থির করেছে :

অবু। একটা ঘোড়ার দাম কি?

সাহেব। পাঁচশত পঁচাশ।

অবু। অত নেই সাহেব, ট্যাকে পয়সা আছে গণ্ডা পাঁচ।

সাহেব। কাঠের ঘোড়া মিলতে পারে—প্যালারাম দিলাও হবি হর্স্!

সাহেবের মুখ থেকে কথাটা খসতে-না-খসতেই কাঠের ঘোড়া এসে হাজির,—এসেই তালঠুকে নৃত্যগীত! ততক্ষণে অবুর ভাবনা ধরেছে—

অবু। আমি পিসির বাড়ি যাব—হাতে পয়সা নেই ঘোড়াকে কি খাওয়াব ?

সমাধানটা বাত্‌লে দেয় কাঠের ঘোড়া নিজেই—

ঘোড়া। জল-পী-পী ঘোড়া জল চিবায়ে খাব—
যত খাওয়াবে তত খাব !

এদিকে হার্সটন, দালাল—দুজনের মুখেই খই ফোটে ঘোড়ার প্রশংসায়—

সাহেব। সস্তা ঘোড়া আচ্ছা ঘোড়া।

দালাল। ভারি তেজী ঘোড়া, চড়েই দেখ।

কিন্তু পিঠে চড়ে বসলে ঘোড়াটা কামড়ে দেবে কি না কে জানে? অবুর মন গেছে দমে। মুখে বলছে—

অবু। না সাহেব, ও রথো ঘোড়া আমার পছন্দ নয়।

শুনে হার্সটন তো রেগে টং,—খুদে খদ্দেরটা বলে কী ?—

সাহেব। হোয়াট্, কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্টরথের কাষ্ঠ ঘোড়া না পছন্দ ?—
টুমি হিন্দু না কৃষ্টান ?

অবু এবার সাফ কথা শুনিয়ে দেয়—

অবু। অত শত জানি নে সাহেব, আমি মাসি পিসির অবুচাঁদ।

—কিশোর সংস্করণ পৃ ১০৩-১০৪

থাক্ অবুচাঁদ সুখে বেঁচে-বর্তে। ওদিকে আসরে নামানো হচ্ছে 'এসপার ওসপার পালা'। কিন্তু গোড়াতেই সব গোলমাল। লণ্ঠন হাতে রাধাকান্ত ও অধিকারীর প্রবেশ—

অধিকারী। বলি ও রাধাকান্ত, এখানে আলোর অভাব দেখি যে, মেয়েদের জায়গা একেবারে অন্ধকার।

রাধাকান্ত। মেয়েদের পাছে দেখা যায় তাই ওধারটা—

অধিকারী। ও বুঝেছি। তা ভাল। চল ওধারে দেখি। ও রাধাকান্ত, বলি পুরুষদের দিকটাও যে ভূতচতুর্দশীর রাত্রি দেখছি।

রাধাকান্ত। মোট কয় পয়সার তৈল হল বরাদ্দ, তাতে হবে কি ? এই যে হয়েছে তাই ঢের।

অধিকারী। তাই তো।…বলি ও রাধাকান্ত, শোন এদিকে।…
তুমি দৌড়ে গিয়ে আমার লণ্ঠন কয়টায় তেল ভরে আন।
এই নাও পয়সা…

রাধাকান্ত তো তেল কিনতে ছুটল, এদিকে আসরে ব্যাণ্ডমাস্টার র‍্যাংস্যাং এসে উপস্থিত। যাত্রার আসর যম-অন্ধকার দেখে সাহেবের মেজাজ গেছে বিগড়ে—

র‍্যাং। **Hell and Black hole in total eclipse,** অন্ধকারের
একেবারে পূর্ণগ্রাস—**No light.**

সর্বনাশ! সাহেব চটে গেছে! ব্যাণ্ডমাস্টার রেগে চ'লে গেলে তো সবটাই মাটি! সাহেবকে খুশি করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে অধিকারী—

অধিকারী। গুড্ মর্নিং স্যার, আলো আসবে স্যার, এক্সকিউজ ইয়োর
অনার স্যার, মশালচি চোট্টা স্যার, অল্ তেল পকেট।…

কিন্তু তাতেও নরম হয় না র‍্যাংস্যাং-এর মন—

র‍্যাং। আলো নেই, জায়গাটা দেখাচ্ছে যেন হারমোনিয়ামের
সাদা দাঁতের পাটি প'ড়ে গিয়ে হাসছে শুধু কালো দাঁত-কটা
মিশি দিয়ে।

এতক্ষণে অধিকারীর মাথায় গজায় একটা লাগসই উত্তর—

অধিকারী। ভেরি রাইট স্যার। ইয়োর অনার, এটা হচ্ছে কিনা
বৈতরণী ঘাট জবর জংশন; ফর্ দ্যাট রীজন স্যার, লুক্
ভয়ংকর একটু খালি।

লম্বকর্ণ পালা পৃ ৯৬-৯৭

লোকটার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে!

অন্যদিকে 'কথামালা যাত্রার সঙে'র সুরুতে চোঙদার আর বিল্বেশ্বরের সংলাপটা এইরকম—

চোঙদার। (দূরবীন ক'ষে)…দূরবীনের মধ্যে শা' মোরগের ডিমের
মতো একটা নতুনতরো ব্রহ্মাণ্ড দেখতে পাচ্ছি।

বিল্বেশ্বর। ওরে ভাই, ওটা আমার নেড়া মাথা! এতকাল চুলের
মধ্যে অপ্রকাশ ছিল, কালক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়েছে—
পাকে-চক্রে।

চোঙ। ঐ নতুন ব্রহ্মাণ্ডে একটিও জীবিত তৃণ দেখা যাচ্ছে না।

বি। থাকবে কোথা থেকে? দুই গিন্নিতে মিলে বাধালে ঝগড়া…

লড়াই বাধালে ধুন্ধুমার—রাজায় রাজায়। মধ্যে থেকে উলু খড়ের চালচুলো উড়ে গেল আমার মাথার 'পর থেকে।…দূরবীন দিয়ে দেখে বল তো…চুল আমার মাথার কোন্ আকাশে উড়ে পালিয়েছে ?

চোঙ। থামো—ধূমকেতুর মতো ঝাঁটার মতো কি দেখি ওটা শূন্যে ?

বি। হয়েছে, ও আমার বাবরিই বটে—কোন্ দিকে দেখছ, দাদা ? …কতদূর গেল বল না ?

চোঙ। ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মতালুর কাছাকাছি।

পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯২-৯৩

কিন্তু আকাশ-বিজ্ঞানীর সন্দেহ কি এত অল্পেতে দূর হয় ? চোঙদার এবার চললেন কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়তে, বললেন—

চোঙ। কুয়োতে নামতে হবে, দিনের আলোতে ভালো দেখছি নে—পরিষ্কার ঠিক করা চাই—ওটা ধূমকেতু, না বাবরি, না ব্রহ্মটিকি।…

বলতে বলতে বেচারা বিশ্বেশ্বরকে অসহায় অবস্থায় ফেলে ঘাড়ে দূরবীন নিয়ে চোঙদার ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কুয়োতলে। সেখানে কী হল তাঁর ? কাকে শুধোবে বিশ্বেশ্বর ? এমন সময় ভাগ্যক্রমে তার সামনে হঠাৎ ঈশপের আবির্ভাব। এবার ঈশপ-বিশ্বেশ্বরের সংলাপটা হল এইরকম—

(ঈশপের প্রবেশ)

ঈশপ। **Sum Æshop**

বিশ্বেশ্বর। সোমবার তা তো জানি, লোকটা গেল কোথা দেখ।

ঈ। **Silentio Evasit — He slipped away in silence.**

বি। আমি দেবভাষা বুঝিনে—শাদা বাংলা কন দেবতা।

ঈ। তিনি পিছলাইয়া দূরীভূত নিঃশব্দে !

বি। আর আসবেন না নাকি ?

ঈ। **Ab Amrigo cars redibit**…তিনি আগামী কল্য আমেরিকা ঘুরিয়া পুনরাগমন করিবেন।

বি। এরূপ হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার আবশ্যক শাদা বাংলায় বলেন।

ঈ। অতীতে আর বর্তমানে মিলনান্ত সমালোচনার কার্য—
ambulo—চলিলাম, চলিলাম।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৯৪-৯৫

ঈশপ চ'লে যান, ক্ষতি নেই। কিন্তু কী সুন্দর অনুবাদ! কী সুন্দর বাংলা!

অবশ্য পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা তো বাংলাই,—তার আবার অনুবাদ কী? তার অবিকৃত অকৃত্রিম রূপটাই পরম উপভোগ্য। 'সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্যে'র প্রায় সবটাই এই স্বাদে-গন্ধে ভরপুর। তার থেকে সামান্য একটুখানি আস্বাদ করা যাক। সিন্ধবাদের ঘাড়ে একবার চেপেছিল এক বুড়ো দৈত্য। তাকে ঘাড় থেকে নামাতে গিয়ে সদাগর সেবার কী নাজেহাল! এবার নির্জন দ্বীপে এসে সে দেখতে পাচ্ছে আরেকটা কী জীব বনের মধ্যে,—চেহারাটা মানুষের, কিন্তু বেশ-বাস সবই অদ্ভুত। সিন্ধবাদের সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো সেবারকার সেই দৈত্যটাই ভোল পালটে এবার এসেছে 'বাবু' সেজে। সুতরাং আর কথা কী? দেখা হতেই "বাবুতে সিন্ধবাদে ঝটাপটি"—

সিন্ধবাদ। দুষ্ট বুড়া কান্ধে চাপতি চাও পুনর্বার, মনে নাই পেরেসান কৈরাছিলে পঞ্চম ছফরে! ঘোড়া চাপিয়া বেড়াইলে আমার স্কন্ধে চ'ড়ে! খালাসিগণ, ইহাকে বন্ধন কর শক্ত কৈরা। না বুঝে দুষ্টেরে লইয়া কান্ধে পৈরাছিলাম বিষম ফান্দে, এবারে রাহু ধরেছে চান্দে, এখন বিপদে পৈরে কান্দে!...

বাবু। সে কোথাকার একটা গাল-গল্পের চিম্‌সে বুড়োর সঙ্গে আমার তুলনা দিচ্ছ ছাহেব! সে ছিল রোগা, আমি দেখ মোটা। বুড়ো নই, চুল কালো, দাঁত পড়ে নি একটি, কমে নাও বয়েস।

খালাসি। খেজাব লাগিয়েছে, দাঁত বাঁধিয়েছে কর্তা।

বাবু। যেতেছিলাম হস্তিরাজার কন্যাদানে।
বনবাস হল সেই কারণে॥
ও হিন্দবাদ, তোমার নাম কী, আমায় রক্ষা কর।

বাবুর কাকুতিতে মনটা গলে যায় সিন্ধবাদের। এবার নরম সুরে বলে—

সিন্ধ। আমার নাম হিন্দবাদ নয়—ছন্দবাজ জাহাজি, বোগদাদ হল ডেরা আমার। আমার জাহাজগুলো সাত সমুদ্দুর

তেরো নদীর লোনা আর মিঠা জলে চলাচল কৈরা কিঞ্চিৎ জখম হয়েছে, সেই কারণে কিছু মন-পবন কাষ্ঠের পিয়োজনে এদেশে আগমন। হঠাৎ বনের মধ্যি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সুতরাং সব ভালো যার শেষ ভালো—

মালামৎ না করিব তোমার খাতেরে।
রহম হইল মুঝে দেখিয়া তোমারে॥

পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৩৯-৪১

—পশ্চিমবঙ্গীয়ের সঙ্গে পিঠ-পিঠ কথা-চালাচালি ক'রে কেমন খোলতাই হয়েছে সিন্ধবাদের মুখের ভাষাটা!

আবার ইংরেজি, হিন্দী, বিকৃত ও অবিকৃত তৎসম, তদ্ভব এবং দিশি শব্দের মিশ্রণও কম উপভোগ্য নয়। 'এসপার ওসপার' পালায় ডাক্তারের ভূমিকায় র‍্যাংস্যাং নহুষের দেহ পরীক্ষা করছে, নহুষের সঙ্গে আছে তার সূক্ষ্মদেহ আত্মারাম—

র‍্যাংস্যাং। রাজাবাবু, তোমার 'হাওয়ান-দেলকী' বিমারি আছে। দেখি হাত—অতিশয় চঞ্চল এবং দ্রুত যাচ্ছে—যেন হাওয়া-গাড়ি। জিব দেখাও। দন্ত বাহির কর (দন্ত উৎপাটন) ইস্! গজদন্ত !!

নহুষ। হে আত্মারাম!

র‍্যাং। মুখ বন্ধ কর। দেখি পেট—ও ম্যাজেস্টিক! ডবল ফিফটি ফোর ইঞ্চেস্!

আত্মারাম। ইঞ্চি কি গজ বল সাহেব!

র‍্যাং। নাউ হার্ট।

(নহুষ ঘাড় দেখায়)

আত্মা। বুড়োরস্ক ব্রেস্কস্কন্ধ দেখছ কি সাহেব, অজরাজ গজরাজ একসঙ্গে।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১০৬

নহুষের সূক্ষ্মদেহের স্থূলত্বজ্ঞান আর সংস্কৃতজ্ঞান দুটিই অসাধারণ।

কালকেতু-উপাখ্যানে স্বর্ণগোধিকারূপিণী চণ্ডীর কথা আছে। বনে শিকার করতে গিয়ে কালকেতু পিছু নিয়েছিল একটা হরিণের, শেষটা তাই হয়ে

দাঁড়ালো সোনালি রঙের গোসাপ। এর কাছাকাছি একটা ঘটনা ঘটে গেছে 'কঞ্জুষের পালা'য়। একেবারে চাক্ষুষ ঘটনা, কুঞ্জলালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা,— পথে যেতে যেতে বলছে যক্ষিবুড়ো আর তার খুড়ি সক্ষির কাছে। কুঞ্জ গিয়েছিল একটা হানা-বাড়িতে, দেখে 'অন্ধকারে একটা চোর-কুটুরি, তার মধ্যে একটা লোক ব'সে কেবলি করছে বিড় বিড়াং স্বাহা'! তার সামনে মড়ার মাথার উপর একটা টোটা জ্বালানো, থেকে থেকে নীল লাল আলো দিচ্ছে। শুনে সক্ষি রুদ্ধশ্বাসে বললে—'তারপর তারপর।'—

কুঞ্জ। বাপ্‌রে-সে আমি বলতে পারব না।

যক্ষি। বলতে পারবে না তো সাথে এলে কেন?

কুঞ্জ। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েছি কি ঝপ্ করে আলো নিবে গেল।

সক্ষি। তারপর!

কুঞ্জ। তারপর শব্দ শুনলুম যেন কে বললে—কস্ত্বং ভো!···

যক্ষি। তারপর কি হল?

কুঞ্জ। দেখলেম সট্ করে একটা সাদা সাপ।

সক্ষি। চুপ চুপ! বল্ লতা লতা—বাস্তুলতা দেখেছিস—তোর কপালে রাজত্বি আছে।

কুঞ্জ। ···সাপটা বেরিয়েই রূপ বদলে হল একটা উল্কামুখী বেড়াল। তারপর বহুরূপী গিরগিটি না হয়ে লেজে পিঠে রামধনুকের রং ফোটাতে ফোটাতে সোনার বর্ন হয়ে ঢুকল যেয়ে পাচিলের ফাটলে—বস্ আর কেউ নেই।

সক্ষি। অন্নপূর্ণার গোসাপ! বাপু আজ থেকে তোমার আর পেটের ভাবনা করতে হবে না।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ১৪০

কুঞ্জলাল তো অন্নপূর্ণার সোনার গোসাপের দেখা পেল, হয় তো তার কপালও যাবে ফিরে; কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে রাজার রাজ-ভাণ্ডারের সোনাদানাও যায় হাওয়ায় মিলিয়ে আর তার ফলটাও ফলে হাতে-হাতেই। ঠিক এই কথাটাই বলা হয়েছে 'রাসধারী' পালায়। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, তবে পৃথক্‌ভাবে বলার দরকার নেই,—ফটিক শহরের রাজা মন্ত্রী সভা-পণ্ডিত আর গোপাল ভাঁড়ের সংলাপ থেকেই বোঝা যাবে—

মন্ত্রী। মহারাজ! সমূহ বিপদ উপস্থিত!…একবার সভায় গেলে ভালো হয়।…দেশের সব সোনা পাখি, প্রজাপতি আর মাছ হয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল…

রাজা। চল…রাজসভায়।…কই গোপাল, জোব্বাটা দাও না?

ভাঁড়। এ কি, মহারাজের গায়ে জোব্বা যে বড়ো ঢিলে হল!

মন্ত্রী। তাই তো, হাত দুটো যে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে!

পণ্ডিত। পশ্চাতের দিকে রাজবেশ যে ময়ূরপুচ্ছের মতো লম্বমান রইল দেখি?

রাজা। এ কি ব্যাপার? আমি এত ছোটো হয়ে গেলাম, এর মানে কি? · মন্ত্রি, শীঘ্র দর্জি ডাকো, গজ এনে মেপে দেখ, আমার মনে হচ্ছে, আমি ক্রমেই ছোটো হচ্ছি। যাও বিলম্ব করছ কেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজার হুড়কোতে তো হাত যায় না, মনে হচ্ছে যেন আকাশে উঠে গেছে।

সকলে। তাই তো, আমরা সবাই যে হাতে-বহরে ছোটো হয়ে গেছি!

রাজা। এখন উপায় কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

পণ্ডিত। সভায় চলুন, বিচার বিতর্ক ক'রে উপায় স্থির করা যাবে।

রাজা! এখন এ-ঘর থেকে বার হই কি করে? সভা তো দূরের কথা।

মন্ত্রী। তাই তো!

পণ্ডিত। এ যে আমরা পিঞ্জরের মধ্যে শাখা-মৃগের মতো বদ্ধ হলেম!

এই অদ্ভুত বিপর্যয়ের কেউ যখন কোনো কারণই খুঁজে পাচ্ছে না, রাজা তখন বিদূষকের দিকে চেয়ে বললেন—

গোপালভাঁড়, তুমি কি ঠাওরালে শুনি?

গোপালভাঁড় বললে—

দেশে সোনা নেই, তাই আমরা সবাই খাটো হয়ে গেলেম।

—একে তিন তিনে এক পৃ ১০৪-'৫, ১১০-'১১

এর চেয়ে বড়ো সত্য এবং এবং এর চেয়ে বড়ো ঠাট্টা আর কী হতে পারে!
কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করি।

১২

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আমরা বলেছি অবনীন্দ্রনাথের পালাগানে ছড়ার অজস্রতার কথা, উল্লেখ করেছি তাঁর সংলাপ-রচনায় 'ছড়ার ছন্দে'র বিবর্তনের কথা। বিষয়টি এবার বিশদ করা যাক।

অবনীন্দ্রনাথের কোনো-কোনো পালাগান যেন ছড়ারই মালা। 'ফসকানো পালা', 'বৃক ও মেষ পালা'র তো বলতে গেলে সবটাই ছড়া, আর একটু পরে-পরে ছড়া না থাকলে 'ভূতপত্‌রীর যাত্রা' তো এক পা-ও এগোতে পারে না, যদিও অনেক ক্ষেত্রে এরা লুকিয়ে আছে গানের ছদ্মবেশে। 'ফসকানো পালা'র সূচনাতেই দেখছি—

পাতা। ছাদে ও আঙুর লতা
এত কাল ছিলি কোথা
লতা। এত কাল ছিলাম বনে…
পাতা। বনে যে শ্যাওলা এল,
লতা। পালিয়ে আসতে হল

—লম্বকর্ণ পালা পৃ ৭৬

সংলাপটি দলমাত্রিক (স্বরবৃত্ত) রীতির ছড়া, আব তাতে আছে ভারি মিষ্টি একটি লিরিক সুর। এছাড়া—

সকলে। আস আস নিলু বুলু
বুড়ো ভুঁড়ু ঢুলু ঢুলু

কিংবা—

আলটপ্‌কা। লাফালাফ লাফালাফ
ঝপাঝপ্‌ থপাথপ্‌
টপাটপ তোলো হাত

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮০

এসব কথায় দলমাত্রিকের শ্বাসাঘাত আর দ্রুত স্পন্দন উপভোগ্য।

আবার 'বৃক ও মেষ পালা'র আরম্ভে—

বিদ্যাধর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
একই নিয়ম আসছে চলি
চিত্রোদ্ঘাটন করেন এসে
দুষ্ট বৃষে শিষ্ট মেষে

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮৪

এই উক্তিটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তৃতীয় ছত্রে 'চিত্রোদ্ঘাটন' পর্বের প্রয়োগে মুন্সিয়ানা আছে। এদিকে চতুর্থ ছত্রের অনুপ্রাসটিও মোক্ষম। এ ছাড়া—

বিদ্যাধর। পাগলা ঝোরার নেকড়ে বাঘ
চোখ রাঙিয়ে ফুলিয়ে নাক
ছাগলার 'পর বিষম রাগ…

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮৪

কিংবা— ছাগ। কইতে কইতে আমার কথা ফুরাবে কি ?
বইতে বইতে নটে শাকটা মুড়াবে কি ?
হুড়ুদুম্বার মন্তর এবার কুলাবে কি ?

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৮৮

ছত্রগুলির পর্বমাত্রা ও পর্ববিন্যাস লক্ষণীয়। 'হুড়ুদুম্বার' পর্বটি চমৎকার বসেছে, আর 'মন্তর এবার' পর্বেও বিশেষত্ব আছে।

'ভূতপত্‌রীর যাত্রা'র কিছু-কিছু অংশ ছড়ার আলোচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। তা ছাড়া—

আছে মাঠের মাঝে শ্যাওড়াগাছের ঝোপ,
অন্ধকারে কালো বিড়াল
ফুলিয়ে আছে গোঁফ।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৮

কিংবা— গাছের গোড়ায় ব্যাঙের হাঁচি
পাতায় বসে উড়ল মাছি
মশক বলে চললে বাঁচি।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৬৬

অথবা—

হাইটে চল হাইটে চল
বৈসে থাকার চাইতে ভালো
হয়ে এল অন্ধকার।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৫

এরকম আরো বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপরের সবগুলি দৃষ্টান্তে পূর্ণপর্ব মাত্রই চার মাত্রার, আর তাদের বেশির ভাগই চতুর্দল। কথাটা এই কারণে বলছি যে, ছড়ার বাঁধুনি হল আটপৌরে 'লৌকিক ছন্দে'র। এর প্রত্যেক পূর্ণপর্বে 'দলে'র সংখ্যা চার না হলেও ক্ষতি নেই, পর্বগুলিতে মোটামুটিভাবে চার মাত্রার একটা সমতা থাকলেই চলে। 'আমার কথাটি'-র সঙ্গে 'ফুরুল' এবং 'নটেগাছটি'-র সঙ্গে 'মুড়ুল' —ছড়ায় সহজেই কাঁধ মিলিয়ে চলে। এই ঢিলে-ঢালা বাঁধুনির জন্যেই ছড়ার ছন্দ আমাদের আটপৌরে 'বাক্‌ছন্দে'র এতখানি কাছাকাছি। অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মতো তাঁর পালাগানের সংলাপেও এসেছে দলমাত্রিকের আদল। সব সংলাপ অবশ্যি পদ্যের ভঙ্গিতে লেখা নয়। আর তা হবার কথাও নয়,— তবু অন্যত্র যেমন তাঁর গদ্য কথাগুলিতে তাল ভেঙেও মোটামুটি একটা ছন্দের কাঠামো বজায় রেখেছেন তিনি, এখানেও তাই।

এই তাল ভেঙে তাল রাখার কথা প্রথম অধ্যায়েও প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা হয়েছে। এর প্রথম পাঠ তিনি নিয়েছিলেন ছড়ার কাছে। ছড়াই ব'লে দিয়েছে তাঁকে, পর্বগুলিতে ভাষা-পরিমাণের একটু-আধটু অসংগতি ধর্তব্য নয়। তাই গদ্য সংলাপের বেলা তো বটেই, এমন-কি ছড়া কিংবা গানে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও এই অসংগতিকে অল্প-বিস্তর প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি। সামান্য দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রথমে ধরা যাক ঝিঁঝি ও অবুর সংলাপ: 'ঝিঁঝির বাদ্যগীত—অবুর উত্তর':

[ঝিঁঝি] চললে বাঁচি চললে বাঁচি
[অবু] আরে বাবু চলতেই তো আছি।
[ঝিঁঝি] চললে বাঁচি চললে বাঁচি
[অবু] কেন কাটো আর কানে থামচি,
চললে পরে আমিও বাঁচি।

[ঝিঁঝি] চালতা খাও চলতে চলতে।
[অবু] সে কথা আর হবে না বলতে
চলতে চলতে খেতে আছি
পাল্কি পেলে এখন বাঁচি।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৬৬

ছন্দের নিয়মে 'এই্' 'ইও' 'আও' প্রভৃতি যুগ্মস্বরধ্বনি এক-একটি রুদ্ধ দল। সুতরাং উপরের উদ্ধৃতির পর্ব-বিচারে দেখতে পাচ্ছি, ঝিঁঝির উক্তিতে একমাত্র 'চালতা খাও' পর্বটি ত্রিদল, বাকি সবগুলি চতুর্দল। আর অবুর উক্তিতে 'চলতেই তো আছি' 'কেন কাটো..আর' এবং 'হবেনা বলতে'—এই তিনটি পর্ব পঞ্চদল, বাকিগুলি চতুর্দল। বলা বাহুল্য সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যেই এখানে এই অসংগতি মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ছড়ার দিক থেকে এতে কিছু মাত্র আপত্তি নেই : সে নিজেই বলে—

খুকুমণিকে নিয়ে যাব বকুলতলা দিয়ে

কিংবা—

তেলিমাগিরা মুখ করেছে কেন রে মাখন- চোরা

অথবা—

কলুবাড়ি যাও তেল আনো গে আমি দিব তার কড়ি

আর শুধু একটি উদাহরণ দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। ধরা যাক 'লম্বকর্ণ পালা'য় মিঞাসাহেবের সেই 'ছাগ-বাগে'র 'রুবাই'—

ছ'য়ে আ-কার 'গ'— ছাগ
'ব'য়ে আ-কার 'গ'— বাগ
ছাগে বাগে এক ঘাটে
জল খায় চক্-চ...চক্-চ

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৪

এখানে শেষ দুটি ছত্র সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না,—এদের পর্বগুলির দলসংখ্যা যথাক্রমে চার-তিন, দুই-চার—অর্থাৎ বলতে গেলে এরা প্রায় কাঁধ মিলিয়েই আছে। আর প্রথম দুটি ছত্রে পর্বের দলসংখ্যার যত অসংগতিই থাক, 'ছড়া' তার কোনো প্রতিবাদ করবে না। কেন-না মিঞার 'রুবাই' বলছে—

'ছ'য়ে আ-কার 'গ'— ছাগ
'ব'য়ে আ-কার 'গ'— বাগ

আর 'ছড়া' নিজেই জানতে চায়—

গোরুতে কেন থায়?

এবং গোরুকেই প্রশ্ন করে বসে—

কেন রে গোরু থাস?

অর্থাৎ অবস্থা-বিশেষে ওজনের দিক থেকে ছড়ায় এক 'দল' আর পাঁচ 'দলে'র ব্যবধানটা অলঙ্ঘ্য নয়।

১৩

এবার আসা যাক অবনীন্দ্রনাথের পালাগানের গদ্য-সংলাপের বাক্‌পর্ব-বিচারে। আগেই বলেছি, ছন্দের প্রাণ হচ্ছে পুনরাবৃত্তি ও প্রত্যাশা। বস্তুত পুনরাবৃত্তি থেকেই জাগে প্রত্যাশা। পদ্যছন্দে এই পুনরাবৃত্তি ঘটে মুখ্যত পর্বপরম্পরার মাত্রাসমকত্বে। ছড়ার পর্বে দলসংখ্যা অনিয়মিত হতে বাধা নেই, কিন্তু মোটামুটি একটা মাত্রা-সমতা রাখতেই হয়। অনেক সময়ে ঠিক এম্‌নি ব্যাপার ঘটে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য-সংলাপের বাক্‌পর্বে। এটা এত বেশি লক্ষ্য করা যায় যে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। সব রকম দৃষ্টান্ত দিতে হলে কেবল এই নিয়েই একখানা অভিধান হয়ে উঠবে, তার চেয়ে সামান্য কয়েকটি দেওয়া যাক। প্রথমে পর পর দুই পর্ব নিয়েই শুরু করি—

এ কি ব্যাপার?	জেব কাটলে কে? (ল-পা পৃ ২৫)
লব্বু ই টাকার	লোট মশয়! (ল-পা পৃ ২৫)
রোসো রোসো	মাথা ঘুরছে। (ল-পা পৃ ১৬)
শহর-কোটাল	কেউ-কেটা নই! (ল-পা পৃ ১২২)
ওরা নির্দোষ	ওদের ছাড়। (ল-পা পৃ ১২২)
নেচে গেয়ে	বাড়ি যাও। (ল-পা পৃ ১২২)
গোটা কতক	মাছ ধরে দাও (ল-পা পৃ ১২২)
কত ক'রে,	কত ক'রে? (ল-পা পৃ ১০১)
বলকা দুধে	সর পড়েছে। (ল-পা পৃ ১২৩)

থাক্ দুই পর্বের বিন্যাস। এবার দেখা যাক পর-পর তিন পর্ব—

মাঝির কথা—	চলতি বুলি	ছোঃ	(একে তিন পৃ ৭৬)
এ কি দশা?	এ কে করলে?	এ কি!	(ল-পা পৃ ২৫)

কখন এলে ?	অন্ধকার যে ।—	ও কি ও ?	(ল পা পৃ ১৬)
আনেওয়ালা,	যানেওয়ালা,	খাড়া রও !	(ল-পা পৃ ৫০)
নাম করো,	নাম পড়ো,	নাম পড়ো ।	(একে তিন পৃ ৪৯)
সোনার খাঁচা,	রুপোর তালা,	তামার চাবি	(একে তিন পৃ ৭৪)
সোনার খোপ,	সোনার ঘুন্টি,	সোনার বুটি	(একে তিন পৃ ১০৭)
ছাগল নয় হে—	শাপ ভেষ্টো !	শাপ ভেষ্টো !	(ল-পা পৃ ৫)
মৌসিমাতার	সিংতুয়োরের	ভুই দারোয়ান	(ল-পা পৃ ৫০)
জাপটে ধরতে	আমায় ফেলে	মারলে দৌড়	(ল-পা পৃ ২)
ইট-পাটকেল,	আঁচিল-পাঁচিল,	কাটিকুটো	(ল-পা পৃ ১২৬)
চলেন চলেন,	ধর না হে	অক্রুর-সংবাদ	(একে তিন পৃ ৭৩)
সুর ধরি,	চোর ধরি,	ফাঁসিও ধরি	(ল-পা পৃ ১২২)
দাও হে ছোকরা,	আমার হাতে	মোহরগুলো	(একে তিন পৃ ১০১)

এও থাক্‌। আসুক এবার পর-পর চার পর্ব—

যাঃ ফুঃ	উড়ে গেল	বস্‌-বাগিচা	
সাই !			(একে তিন পৃ ১০১)
চলো দেখি	কোথাও একটা	চায়ের দোকান	
পাই কি না ।			(ল-পা পৃ ১২৩)
কে রে টেমি	কে পালাল ?	দেখলি কাকে ?	
চোর না ডাকাত ?			(ল-পা পৃ ১৭)
যাচ্ছি আমি	হাটখোলায়,	বাপের বাড়ি—	
পুজো দেখব ।			(ল-পা পৃ ১৩)
আপাতত	যেতে পার,	আমি একটু	
আরাম করব ।			(একে তিন পৃ ১২১)
তোর আবার	ভাবনা কি ?	যাত্রার দলে	
ভর্তি হবি ।			(ল-পা পৃ ১৭)
কাটলেট,	চপলেট,	ভুটের গান,	
ছাগল-নাচ !			(ল-পা পৃ ১৩)
ভাস্থরক'	দধিমুখ'	মসীপুচ্ছ	
লম্বকর্ণ ।			(ল-পা পৃ ১০)

এবার একসঙ্গে দেখা যাক পর-পর পাঁচ ও ছয় পর্ব—

দে দৌড়,	দে দৌড়,		
একদম	বেলেঘাটার	পুল পার	(ল-পা পৃ ২৫)
কে জানে	পিসির বাড়ি	কত দূর,	
পথ তো দেখি	অফুর।		(ল-পা পৃ ৫৭)
চোর চোর,	বাঘ হ্যায়,	ডাকু ডাকু—	
নগেন, উদো	আলো জ্বাল্!	শিগ্‌গির আয়!	(ল-পা পৃ ১৬)
আদর করে	ডাক দিলেন,—	এসো দাদু	
আমার বাড়ি,	তোমায় দেব	ভালোবাসা।	(ল-পা পৃ ২)
সোনার আলো,	সোনার ধান,	সোনার স্বপন,	
সোনার বর্ণ,	সোনার টিয়ে	সোনার ভাইবোন।	
			(একে তিন পৃ ১০১)

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, এরকম অগুন্‌তি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যেতে পারে পালাগানের গদ্য-সংলাপ থেকে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গদ্যরচনার অংশ হলেও উপরের প্রত্যেকটি বাক্‌পর্বে ছড়ার দলমাত্রিক ছন্দের আদলটি পুরোপুরি রক্ষিত হচ্ছে। এবার এর থেকে বিবর্তিত তাঁর গদ্য বাক্‌ছন্দের আরো একটা পরিচয় দিয়ে এ আলোচনা শেষ করব। এটিও তাঁর পালাগানের সংলাপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, ছড়াকারের মন আর মেজাজ নিয়ে পথে পথে তাল ভাঙতে-ভাঙতে আর তাল রাখতে-রাখতে অবনীন্দ্রনাথ পৌঁছেছেন অনেক নূতন ঘাটে। এতে তাঁর বাক্‌পর্ব-বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে ছড়ার লয়-ভাঙা ছন্দের এক নূতন ধরণের তালতরঙ্গ। আরো মজার কথা, এতে এলোমেলো রকমের 'মিল'-ও দেখা দেয় হঠাৎ-হঠাৎ, ফলে আরো বেশি উচ্চারিত হয়ে ওঠে ছন্দের ঝোঁক। দৃষ্টান্ত ছাড়া ব্যাপারটা বোঝানো সম্ভব নয়, তাই মোটামুটিভাবে পর্বসজ্জা ও ছত্রবিন্যাস করে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি—

খ্যাপা ঘোড়া যেন	ফেলছে নিঃশ্বাস	
হোঁস্ ফোঁস্	হুস্ হাস্!	(ল-পা পৃ ৭২)

ওলো	ঘোমটা তুলেছে—	
এই মরেছে	দেখে ফেলেছে।	(ল-পা পৃ ৬৪)

চল্ চল্

পেড়ে নিতে দে　　খেয়ে নিতে দে

পিচ্ ফেলে দে　　পিচ্ ফেলে দে।　　(ল-পা পৃ ৬৪)

পেড়েছে তো　　পেড়েছে,

যত পেরেছে　　পেড়েছে,

যত পেরেছে　　খেয়েছে—

তোরা বলবার　　কে ?　　(ল-পা পৃ ৬৪)

আমি　　গৌড়েরও নয়

উড়েরও নয়

আমি　　যে সে লোক নয়— হ্যাঁ। (ল-পা পৃ ৬৫)

এঃ

জল কাদায়　　রাস্তাটা হয়েছে　　পিছল—

ঘোড়ার পায়ের　　দাগ

না বাঘের থাবার　　দাগ　　এ-সকল !

আকাশ তো　　পরিষ্কার,

কোথা থেকে এল　　এত জল ?

রাস্তাটা　　চিটে গুড়ের মতো

চিপটে ধরেছে

জুতোজোড়ার　　সুকতল !　　(ল-পা পৃ ৭২)

গোমসামুখো　　গৌরে ওঝা

ঘোমটা খোলা তার　　বৌ

এ হাটের ভূত　　ও হাটে বেচে

আগাক দেখি　　তার কাছে　　কেউ।　　(ল-পা পৃ ৬৫)

'পকেট　　ঝাড়া দাও !'

'পকেট কাটা　　দেখে নাও—

খুঁটে　　খই মুঠা

হাতে এই　　লাঠি-লণ্ঠন—

আর কি চাও ?' (ল-পা পৃ ৫০)

যদি পা পিছলায় হঠাৎ
হবে একেবারে পপাৎ
ঝরনার জলে
নয় ভূমিতলে ! (ল-পা পৃ ৯০)

গেছি গেছি গেছে কান—
এযে শব্দের টর্নাডো বহমান—
নিশ্চয় মাসি ধরেছেন
হাতি-ঘুমপাড়ানি গান।
সুরের কাঁচি
চালাচ্ছেন পিসি কচাং কচাং। (ল-পা পৃ ৬১)

কে জানে এ কোথায় এলাম।
ও কি বলে ?
জিরোও জিরোও—
শব্দমব্দ সব অন্তর্ধান (ল-পা পৃ ৬১)

ছড়ার ছন্দের বিবর্তনের চেহারা দেখুন। এসব উদ্ধৃতি যে গদ্য তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের বাক্‌পর্বের গঠন অনেকটা দলমাত্রিকের আর বিন্যাস ভাঙা-লয়ের অথচ গদ্যকবিতা এরা নয়। তাহলে কী বলব এদের ? —একটি মাত্র নামই বোধ হয় দিতে পারি—'অবনীন্দ্র-রীতির গদ্য'।

১৪

কিন্তু আর ছড়ার আদল-ঘেঁষা গদ্যের কথা নয়,—এবার আসি তাঁর গদ্য-কবিতায়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার একটুখানি ইতিহাস আছে, আর তা আমাদের এ যুগের কবিতার শিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত। 'পুনশ্চ'র ভূমিকা থেকে জানতে পারি, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে' দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে···বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।' প্রথমে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন এটা পরীক্ষা করে দেখতে। সত্যেন্দ্রনাথ 'স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেন নি।' তখন রবীন্দ্রনাথ

নিজেই পরীক্ষা করেছেন, 'লিপিকায় অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে'—যদিও ছাপবার সময় ছত্রগুলিকে পদ্যের মতো সজ্জিত করা হয় নি। এ হল একেবারে গোড়ার কথা।

এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, 'তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।' অবশ্য তার মানে এ নয় যে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় সর্বত্রই ভাষাবাহুল্য ঘটেছে। রচনাগুলি যে 'কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল' রবীন্দ্রনাথ তা গোড়াতেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আপাতত এ-কথা থাক।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে শকুন্তলা রচনার মূলে যেমন ক্রিয়া করেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, প্রৌঢ় বয়সে গদ্যকবিতা রচনার বেলাতেও তাই। দুটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি-উৎসের ধারা। কিন্তু এ ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও একটা বড়ো কৃতিত্ব আছে; গদ্যকবিতা সম্বন্ধে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনকেও দ্বিধা-মুক্ত করেছেন তিনি। সত্যি বলতে, গদ্যকবিতাকে পাঠক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করবে কি না এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে গোড়াতে বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল। তাই 'লিপিকা'র 'পায়ে চলার পথ', 'মেঘদূত', 'বাঁশি', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রভাত', 'সতেরো বছর', 'প্রথম শোক' প্রভৃতি রচনাকে গদ্যের আকারেই ছাপিয়েছেন তিনি। লিপিকার প্রকাশকাল ১৩২৯ সাল (১৯২২)। তার দশ বছর পরে 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় (২রা আশ্বিন, ১৩৩৯) কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, লিপিকা 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' এই ভীরুতা কাটিয়ে উঠতে কবিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে পুরো দশটি বছর।

এদিকে 'পুনশ্চ' রচনার অন্তত পাঁচ বছর আগে কবির অনুরোধ রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, এবং পদ্যের মতো পংক্তিসজ্জা ক'রেই ছাপিয়েছিলেন তাঁর গদ্যকবিতা - 'পাহাড়িয়া', 'মেঘমণ্ডল' আর 'রং-মহল'। ছন্দের নাম দিয়েছিলেন 'গদ্যছন্দ'। (বিচিত্রা: শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক: ১৩৩৪)

যাক ইতিহাস। আসি তাঁর গদ্যকবিতায়। 'গদ্যকবিতা' বলতে এ যুগে আমরা যা বুঝি তার শিল্পরূপ অবশ্যই নূতন, কিন্তু তার ভাবলক্ষণটি পূর্বেও ছিল। 'গদ্যকবিতার গতিক্রম' সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে সত্যকাম-জবালা

কাহিনীর উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গল্পটি সহজ গদ্যের ভাষায় পড়েছিলাম, তখন তাকে সত্যিকার কাব্য ব'লে মেনে নিতে একটুও বাধে নি।' এবং সেই সঙ্গে যোগ করেছিলেন, 'এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত, তবে হালকা হয়ে যেত।' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, জন্ম-শতবার্ষিক সং : ১৪/২৮৭ পৃ)। ওই একই ভাষণে বাইবেলের গদ্য অনুবাদের কাব্যগুণ সম্বন্ধেও তিনি অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অত দূরে যাবার-ই বা দরকার কী? আমাদের সাহিত্যে আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাতেও এমন অনেক গদ্যাংশ পাওয়া যায়, যার স্বাদগন্ধ পুরোপুরি কবিতার। আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'তেই তো এ রকম গদ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। 'পুষ্পাঞ্জলি'র পরিণতি 'লিপিকা'য়।

কথাটা বলছি এই জন্যে যে, আধুনিক কাল যতই নবীন মূর্তিতে দেখা দিক, অতীতের গর্ভ থেকেই তার আবির্ভাব। আবার আজ যা নূতন, কাল তাই হবে পুরাতন, এবং তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে পরবর্তীকালের 'আরো-নূতন'। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণ সচেতন। বিচিত্রার যে-সংখ্যায় প্রথম বেরোল তাঁর গদ্যকবিতা তার পূর্বের সংখ্যাতেই (আষাঢ়, ১৩৩৪) দেখছি তাঁর একটি প্রবন্ধ—'নতুন ও পুরোনোর ছন্দ।' তাতে আছে নূতন ও পুরাতনের মধ্যেকার এই গভীর সংযোগের স্বীকৃতি—

> সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানোর, ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হল—গোড়াতে পুরোনো এল, আগাতে নতুন।

এর এক অনুচ্ছেদ পরেই লিখছেন—

> পুরোনো ডালে ধরা থাকে অগণিত নতুন জীবন-বিন্দু, গোপনভাবে, পুরোনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন, সবাই প্রতীক্ষা করছে নববসন্তের দূত এসে পৌঁছনোর।
>
> —বিচিত্রা : আষাঢ়, ১৩৩৪ পৃ ৭১

আমাদের আধুনিক যুগের কবিতায় এই নববসন্তের দূত হয়ে এসেছে নূতন নূতন শিল্পরূপের প্রকাশব্যঞ্জনা,—গদ্যকবিতার ছন্দ-ছাঁদও তাই।

১৫

এক কালে—বিশেষ করে 'পুনশ্চ' প্রকাশের পর—গদ্যকবিতা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠেছিল আমাদের সাহিত্যে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থীদের মত হল, গদ্য তো গদ্যই, সেটা আবার কবিতা হবে কী করে? 'সোনার পাথর-বাটি' হয় কখনো? মধ্যপন্থীরা অবশ্য ততটা অকরুণ হলেন না। 'গদ্যকবিতা' নামটিতে আপত্তি জানিয়ে তাঁরা বললেন, এ হচ্ছে 'গদ্যে কবিত্ব'। প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে তাঁরা যে পুরোপুরি হাত মেলাতে পারেন নি, তার কারণ খুবই স্পষ্ট। বস্তুত 'সোনার পাথর-বাটি'র তুলনা এখানে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। সোনা আর পাথরের উপাদান একেবারে জাত আলাদা, কিন্তু গদ্য আর পদ্যের একটা 'সামান্য উপাদান'ই হচ্ছে ভাষা। এদিকে ছন্দের বিচারেও বলা যায়, পদ্যের ছন্দ যতই সুনিরূপিত হোক, গদ্যও একেবারে ছন্দ-ছুট নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলার পথে তারও আছে একটা স্বনিয়ন্ত্রিত ছন্দোলীলা—'পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে এর নানারকম গতি অবগতি'।

যা হোক, এই বিতর্কের মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম থেকেই অবিচলিত। তিনি বলেছিলেন—

> রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে লিখলে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে লিখলে হবে গদ্যকাব্য।
>
> —রবীন্দ্ররচনাবলী : জন্ম-শতবার্ষিক সং : ১৪/২৮০ পৃ

সাধারণ গদ্য হল বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর গদ্যকবিতা অনুভববেদ্য—

> বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, একে অনুভব করতে হয় রসবোধে।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৭৬-২৭৭

গদ্যকবিতার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> গদ্যকে কাব্যের প্রেরণায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত।
>
> —পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৮৮

এই 'গতি'কে নিয়ন্ত্রিত করে একটি বিশেষ প্রকৃতির ছন্দোলয়—

> গদ্যকাব্যেও একটা আ-বাঁধা ছন্দ আছে। আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি

অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভার-সামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না।

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৮০-২৮১

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, গদ্যকবিতায় যে 'ভাববিন্যাসের শিল্প' আছে তার থেকেই জন্ম নেয় 'ভাবের ছন্দ', আর এই ছন্দ বাক্‌পর্বের 'সমান ভাগ মানে না' বটে, কিন্তু 'সমগ্রের ওজন মেনে চলে।' তাই এর 'ভাবগন্ধী পর্ব' পদ্যের মতো সুনিরূপিত না হলেও সাধারণ গদ্যের মতো একেবারে অনিরূপিতও নয়।

কিন্তু পরোক্ষ আলোচনার সাহায্যে শিল্পবস্তুর আর কতটুকু জানা যায়? কতটুকু ধরা পড়ে তার শিল্পপ্রক্রিয়া? তার চেয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি বিশদ হয়। একটা কথা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি, আবার অবনীন্দ্রনাথের পালাগানের সংলাপের আলোচনা প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছি। বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের মুখের কথার বাক্‌পর্বে রয়েছে মোটামুটি একটা চতুর্মাত্রকতার ঝোঁক। ভাষার এই প্রবণতা গদ্যে যতটা লক্ষ্য করা যায়, গদ্যকবিতায় তার চেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রং বেরঙের সুতোগুলো থাক,
থাক পড়ে ঐ জরির ঝালর।

তখন এতে শ্বাসাঘাতপ্রধান দলমাত্রিক পর্বের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরে কবি যখন বলেন—

শুনে ঘরের লোক বলে,
"যদি না বাঁধো জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে?"

রবীন্দ্ররচনাবলী : জন্ম-শতবার্ষিক সং : ৩/১৮১ পৃ

তখন বুঝতে পারি, শেষাংশের দ্বিতীয় ছত্র থেকেই একটু একটু ক'রে পালটে যাচ্ছে পর্বের ঢঙ, প্রথম ছত্রের উচ্চারিত শ্বাসাঘাতটি আর নেই, ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে সুর হয়ে এসেছে মসৃণ, ছন্দের কোমল ঢেউগুলিতে যেন 'তান-প্রধানে'র প্রবণতা। ঠিক তেম্‌নি, অবনীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

বরফ-গলা নতুন নদী—উছলে পড়ে, উল্‌সে চলে—

সে কি ধরে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখির রূপের ছায়া?

—বিচিত্রা : শ্রাবণ, ১৩৩৪ : পৃ ১৭৭

তখন প্রথম ছত্রে স্পষ্ট কানে আসে লৌকিক ছন্দের চতুর্দল পর্বের শ্বাসাঘাত। তার শেষ দুটি পর্বে তা যেন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে—আর সঙ্গে-সঙ্গে চোখের উপর জীবন্ত হয়ে ওঠে পাহাড়ে নদীর ক্ষিপ্রগতি। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের গোড়াতেই স্তিমিত হয়ে আসে সেই অস্থিরতা, কেননা এখানে ভাবের ব্যঞ্জনাটি একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির: 'সে কি ধরে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখির রূপের ছায়া?'—কথাগুলি শান্ত-মধুর, ভাবটিও তাই। বাক্‌ছন্দের বিশেষ ঝোঁকে 'নিয়ে' এবং 'পিয়াসী' শব্দের যুগ্মস্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট হওয়ায় এখানে প্রথম দুটি পূর্ণপর্বের স্বর-ব্যঞ্জন-ধ্বনিতে লেগেছে একটি কোমল তানের ছোঁওয়া—সে-তান ছড়িয়ে গেছে অন্তিম পর্বের 'রূপের ছায়া'তেও।

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে: শ্বাসাঘাত-প্রধান, তান-প্রধান, ধ্বনি-প্রধান—সবরকম ছন্দোরীতির মিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটতে পারে গদ্যকবিতায়। উপরের শেষ উদ্ধৃতিটিই মন্দ কী? কথার প্রকৃতি অনুযায়ী ঝোঁক দিয়ে পড়লে এর প্রথম ছত্রটি শ্বাসাঘাত-লক্ষণাক্রান্ত—পর্বগুলি চতুর্দল, চতুষ্কল। কিন্তু ধ্বনি-প্রধান রীতির নিয়মে মুক্তদলে 'এক' আর রুদ্ধদলে 'দুই' কলা ধরলে এর প্রত্যেকটি চতুর্দল পর্বে পড়বে পাঁচ মাত্রার ওজন—

১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
ব রফ্ গ লা | ন তুন্ ন দী ॥ উছ্ লে প ড়ে | উল্ সে চ লে I

এদিকে দ্বিতীয় ছত্রের 'সে কি' কথাটিকে অতিপর্ব আর 'রূপের ছায়া'-কে ঊনপর্ব হিসেবে দেখলে 'ধরে নিয়ে যায়' আর 'পিয়াসী পাখির' পর্ব দুটিকে ইচ্ছে করলেই ধ্বনি-প্রধান রীতির নিয়মে ছয়মাত্রার ওজন দেওয়া যায়। আবার যেভাবেই পর্ববিভাগ করি না কেন, কথাগুলিতে—বিশেষ করে তাদের ভাবানুগ বর্ণবিন্যাসে—এমন একটি সংগীতগুণ ফুটে উঠেছে যা শুনে মনে হয় এ যেন একটি কোমল সুরের তান। ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলিকে একবার 'গানের আলাপে'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, এও যেন অনেকটা তাই।

আরো একটা কথা: স্মরণ থাকতে পারে, অবীন্দ্রনাথের বাক্‌পর্ব-বিন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে আমরা টেনে-চলা ছন্দ, গুটিয়ে-আনা ছন্দ, দোলনার ছন্দ প্রভৃতির কথা বলেছি। কবিতার প্রচলিত ছন্দোরীতির সঙ্গে এগুলিকেও গদ্যকবিতায় চমৎকার মানিয়ে নেওয়া যায়। বস্তুত তাঁর 'পাহাড়িয়া'

গদ্যকবিতা থেকে এরকম যৌগিক ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত প্রথম অধ্যায়েও উদ্ধৃত করা হয়েছে। আসল কথা, গদ্যকবিতায় বিভিন্ন ছন্দোরীতির যতই মিশ্রণ ঘটুক, এমন-কি পর্বের মাত্রাসমকত্বের নিয়মও যতই ব্যাহত হোক, 'সবশুদ্ধ জড়িয়ে' রক্ষা করতে হবে একটি 'ভারসামঞ্জস্য।'

১৬

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি যে ভাষাবাহুল্যের কথা বলেছেন তা সত্য, তবে সৌভাগ্যক্রমে সবখানে তা ঘটে নি। শিল্পীর কৃতিত্ব-বিচারে দেখতে হয় কোন্‌খানে তার কীর্তি সবচেয়ে সার্থক। সেদিক থেকে বলব, ভাষার পরিমাণ-সংগতি যেখানে যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত হয়েছে সেখানে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার লিরিক সৌন্দর্য তুলনাহীন। মনে হয় এবড়ো-খেবড়ো পার্বত্য প্রকৃতির মাঝখানে টলটল করছে এক-একটি স্বচ্ছ রমণীয় হ্রদ।

এমনি কয়েকটি রমণীয় সৌন্দর্যবিন্দুর উপর এবার আমরা চোখ বুলিয়ে নিই। একটি দৃষ্টান্ত তো একটু আগেই দিয়েছি—'পাহাড়িয়া'র সেই বরফ-গলা নদীটির বর্ণনা, যে-নদী 'ধরে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখির রূপের ছায়া।' তেমনি আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে ওই এক-ই কবিতায়—

যেদিকে বেড়া দিয়েছে সূর্যমুখী ফুলের গাছ
সেদিক থেকে ছাড়া পেয়ে আসে সুর
যেখানটায় পাথর ভিজিয়ে আসে জল
সেপথ বেয়ে আসে ভোরে ভোরে গান।

বিচিত্রা : শ্রাবণ, ১৩৩৪ : পৃ ১৭৬

কিংবা—

ঝরণা যেখানে সরু একগাছি আলোর মালা দিয়ে
বেড়ে নিয়েছে একখানি পাথর
উষার এই মনের পাখি
উড়ে বসে কি সেইখানে?

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ১৭৭

অথবা—

সে কি ঝরণার পাখি না ঝাউবনের
না উপর পাহাড়ের,
না ওই পাহাড়তলার চা-বাগিচার
নীচের জঙ্গলের ?
সে কি থাকে একলা কোনো পাথরের ফাটলে,
না সে বাসা নিয়েছে আমার সঙ্গে
কাচমোড়া ঘরেই ?

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ১৭৮

লিরিক স্বাদ আর কাকে বলে ? এরকম আরো অনেক পংক্তি তুলে দেওয়া যেতে পারে ওই একই কবিতা থেকে। এবার দেখা যাক 'মেঘমণ্ডলে'র কয়েকটি ছবি :

মেঘেরা দুই জাতের, দুই রঙের—

বাসিন্দা মেঘ কস্তুরী-কালো ভারি ডানা,
নিবাসিন্দা মেঘ ধুতুরা-সাদা লোটানো-পাখনা।

দুই দল মেঘ-পায়রা এরা—

বসে ওরা এপারে ওপারে ঝর্ণার
রোদ ঝিল্‌মিল্ উত্তর হাওয়ায় ডানা মেলে।

এরা—

শীতের বেলায় নতুন পাখি—
জলভরা মেঘ জলহারা মেঘ,—
ঝিলিক-দেওয়া পাখনা মেলিয়ে ঘোরে ফেরে
বাতাসে-লোটানো ডানা হেলিয়ে ওঠে নামে।

—পূর্বোক্ত পত্রিকা : কার্তিক, ১৩৩৪ : পৃ ৬৬২

পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সারাদিন ধরে এলোমেলোভাবে চলে তাদের ঘোরাফেরা—

ঘোরে ফেরে খেলে খেলা সারাদিনই,
আকাশে লোটায় বাতাসে লোটায় লোটায় পাথরে,

ঝর্ণার স্রোতে ধরে ছায়া আর ছায়া
—কায়া আর ছায়া পাশাপাশি
ক্ষণে ক্ষণে আসে যায়।

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৬৬৩

এ যেন জাদুর খেলা। স্বপ্নের মতো চোখে ভাসে পাহাড়ের গায়ে দুই-রঙা মেঘ-পায়রাদের অলস আনাগোনা। তাদের 'লোটানো পাখা' 'আকাশে লোটায়, বাতাসে লোটায়, লোটায় পাথরে', কখনো ছায়া ফেলে ঝর্ণার জলে—সেখানে খেলা করে 'কায়া আর ছায়া'—তারাও হঠাৎ কখন ভেল্কির মতো যায় মিলিয়ে।

কিন্তু চক্ষের পলকে আর-এক ভোজবাজি লেগে যায় 'রঙ-মহলে'। এবার আর কালো-ধলো মেঘ-পায়রার উড়ে বেড়ানোর স্বপ্ন নয়, একেবারে বাদশাহী খোয়াব,—দিল্লি-আগ্রার নয়, খাঁটি পরীস্তানের। জানি নে কোথায় সে পরীস্তান—বোধ করি পাহাড়-দেশেরই কোনো-এক অচেনা অংশে। কিন্তু এর চোখ-ধাঁধানো জলুসের কাছে কোথায় লাগে মোগল-প্রাসাদের রোশনাই? তবু এ-দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য। দুটো 'রঙ-মহল'ই লোকচক্ষের অন্তরালে। একটিকে আড়াল করেছে ইতিহাস, আর-একটিকে আড়াল করেছে স্থূলদৃষ্টির আবরণ। আমরা যতদূর জানি, কালের পর্দার একপ্রান্ত সরিয়ে আড়াইশ' বছর পূর্বেকার দ্বিতীয় শা-মামুদের বিলাস-প্রাসাদের অন্তঃপুরে একবার প্রবেশ করেছিল 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সেই নামহীন অদ্ভুত নায়কটি, আর স্থূলদৃষ্টির অভ্যস্ত আবরণ উন্মোচন ক'রে পরীরাজ্যের এই রহস্যময় রঙ-মহলে একটিবার প্রবেশ করেছিলেন 'কলমগীর অবনীন্দ্রনাথ'। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র নায়কের মতো তিনিও পড়েছিলেন এর সম্মোহে,—মোহাবিষ্টের মতো একা একা ঘুরে বেড়িয়েছেন এর অলিন্দে-চত্বরে, ফোয়ারার ধারে, কক্ষে-কক্ষান্তরে—শিষ্-মহলে, জলসাঘরে।

এই মায়াপুরীর সব-কিছুতেই জাগে আচম্‌কা বিস্ময়। এখানকার মালঞ্চে 'সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন' নিয়ে বয় 'গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের'—

হঠাৎ খোলে যেন দক্ষিণ দুয়ার শীতের রাত্রে
ফুলবোনা কিংখাবের পর্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পৌঁছয় বাতাস

সোনার পিঁজ্‌রাতে মাণিকে-গড়া
খেল্‌না বুলবুলির কাছে
—পরীস্তানের বুলবুল সে
ঘুম জানে না নেচেই চলে
বলে অবিরত— পিও পিও পিও!

—পূর্বোক্ত পত্রিকা : ভাদ্র, ১৩৩৪ ; পৃ ৩৩৮

বুলবুলের গানে গোলাপবাগে ছুটে বেরিয়ে আসে ফুলের ফোয়ারা—

দেখি ফোয়ারা উঠছে গোলাপবাগে
উঠছে পড়ছে তালে তালে
মণি-মঞ্জীরের ছন্দ ধরে ;
উল্‌সে উঠছে গোলাপ-জল ফুহ্‌রী দিয়ে,
ঝর্ণা বইছে উপবনে—
আবিরে চন্দনে মদে আর মেহুন্দিতে রাঙানো।

পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৮

ততক্ষণে 'পরীস্তানের খোস্‌বু হাওয়া'র একটুখানি ছোঁয়াচ পেয়ে, গুল্‌জার হয়ে ওঠে বাগিচা—বুলবুলির গানে আর রকমারি ফুলের গুল্‌বাহারি নেশায়। অম্‌নি—

বনের তলায় বসে যায় সবুজ দরবার,
ফুলে ফুলে ফুল-বিছানো মসনদ জুড়ে।

এখানকার কাচ্‌-মহল দেখে মনে হয়—

ঠুনকো, ভারি পল্‌কা
একেবারেই হালকা
যেন পরীস্তানের ময়ুর-পঙ্খী পাখিটি!
সায়র-নীল ছায়ার ঘেরে ধরা
বুদ্বুদ একটি যেন সাতরঙা!

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৬

তার একপাশে আছে—

চিকন্‌কারি কাচের ঢালাই শিষ্‌-মহল,—
চিকন্‌ গাঁথনি এমন,—

যে আলোর ভারে ভাঙল বুঝি,
মিলিয়ে গেল বা হাওয়ায় হাওয়ায়

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৬

অন্য পাশে—

পল-তোলা কাচের ঢাকনি দেওয়া রঙ-মহল,
রঙন-ফুলের রেণু-মাখা,

যখন জলসা নেই, তখন তাকে দেখে মনে হয়—

কাচ্-পাখনা মৌমাছির
ছেড়ে যাওয়া মৌচাকটির প্রায়,

কিন্তু জলসার সময়ে—

দেখি আর-একদিনের রঙ্-মহল ঘিরে
খুসির ঝলক্ সাত-রঙা
দিচ্ছে ঝলক্ ফুল-বাসরে ;
মহলে মহলে দিচ্ছে ঝিলিক্
দেওয়ালে আর্সিতে,
কাচের ফুলদানে,
স্ফটিক-ঝালর সামাদানে,
মণি-কাটা পেয়ালাতে,
সোনাতে রূপোতে মণিমাণিক্যে বিল্লোরে।

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৬-৩৩৭

রঙ-মহলে কত বিচিত্র রকমের ফুল, কত বিচিত্র রঙের সমারোহ! তার মাঝখানে চলাফেরা করছে নর্তকী পরীর দল,—ফুলের উজ্জ্বল রঙে ঝলমল করছে তাদের গায়ের অলংকার, আর সেই রঙের শিখায় জলুস ধরেছে তাদের জলসার বাতি—

হিল্লোল দিচ্ছে রঙ—
পহল্দার কানের দুলে, মোতির কর্ণফুলে,
কালো চুলে হীরের ঝাপ্টায়
হাতের পঁহুছায়, কণ্ঠ-মালায়,
নূপুরে গুঞ্জরী-পঞ্চমে,

পায়ের তলায় হেনার রঙে দিচ্ছে ঝলক্,
ধরছে জলুস্ জল্সার বাতি।

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৭

রূপের পরী, সুরের পরী—সবাই নাচে রঙ-মহলে। তারা ঢালে রূপের সুরা, সুরের সুরা, নাচের সুরা—

সন্ধ্যাতারার আলো-ছোঁয়ানো সাহানা সুরে
বেজেই চলেছে সারেঙ্গী ;—
সুরে সুরে আল্সে-টোলে
বিভোলছন্দে চলেছে রাগ-রাগিণী—
গলাগলি সাঁঝি আর ভোরাই

রাগিণীগুলিও আসলে সুরের পরী—

নর্তকীর নূপুরের জিঞ্জীর-পরানো
স্বর্ণমৃগী তারা যেন—
ঘুরছে ফিরছে বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ;
ভেবেই পায় না
রঙ-মহলের হল রাত্রি শেষ
না হচ্ছে রাত্রির আরম্ভ

পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৮-৩৩৯

আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি, জরির মসনদে বসে জলসাঘরের নাচ-গানের এই বর্ণময় উৎসবটি মশগুল হয়ে দেখছেন 'কলমগীর অবনীন্দ্রনাথ'। তাঁর দৃষ্টিও 'বিহ্বল', তিনিও ভাবছেন, 'রাত্রির শেষ না রাত্রির আরম্ভ?' এমন সময় আচমকা চোখ পড়ে রঙ-মহলের এক কোণের কাচের পর্দাটার দিকে—

সাত-রঙা আগুনের রূপটানে মাজা
চিকন্ কাচের পর্দাখানি,
তারি ওপারে রঙ-মহলের অন্দর
আঙুর-লতার আড়াল-করা ছোট্টো মহল—

সেখানে কে রয়েছে বন্দিনী হয়ে? সে কি 'মরুভূমির মেহেরবানি' কোনো মেহেরউন্নেসা? সে কি ক্ষুধিত পাষাণের দ্বিতীয় শা-মামুদের হারেম-বাসিনী

সেই ইরানী বাঁদী? না-কি সে এখানকার-ই প্রকৃতিদুহিতা কোনো 'যূথী অনাঘ্রাতা'?—

সুন্দর ছোট্টো আপনি-ফোটা ফুলটি!

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৯

কিন্তু কে যাবে তার কাছে? 'চিকন্ কাচের পর্দা' আড়াল করেছে। এদিকে আমাদেরও কল্পনার সুযোগটি যায় হারিয়ে। এক মুহূর্তে ছিঁড়ে যায় মায়ার ইন্দ্রজাল, হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নর্তকী পরীর দল, চারদিকে ভেঙে পড়ে শিষ্-মহল, রঙ-মহল,—স্বপ্নের ঘোর যায় কেটে, দিনের রূঢ় আলোকে চোখের উপর ভেসে ওঠে এ কোন্ দুর্ভাগা ছবি? চারদিক জুড়ে এ যে—

হঠাৎ-নবাবীর ফুলকি কাচের কাফন!

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৩৫

একরাশ ভাঙা কাচ ঠেলে, টলতে টলতে বেরিয়ে আসেন অবনীন্দ্রনাথ। কাহিনীর শেষটুকু তাঁর নিজের মুখেই শুনুন—

কটকের বাইরে এসে পড়ি
দিনের আলোতে চশমা চোখে দেখি লিখন—
"শীষ্-মহল—টু লেট্!"

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩৪২

কিন্তু আরম্ভের যেমন একটা আরম্ভ আছে শেষেরও তেমনি আছে একটা শেষ। পরীস্তানের যে-অংশটা পড়েছিল বাস্তবের সীমানায়, বাইরের রোদ-বৃষ্টি গেলে তার কাচটা হয়ে গিয়েছিল শক্ত,—সে-অংশটা আজও হয়তো হঠাৎ চোখে পড়বে কোনো দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের—

মস্ত একটা তালা বন্ধ কাচ্ মহল
শেওলাতে সবুজ।

—পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃ ৩২২

উপসংহার

ভাবছি কী বলব সব শেষে। অবশ্যি শিল্পের বিচারে শেষ কথা বলে কিছু নেই, সেইটেই ভরসা। নইলে বই শেষ করবার মুহূর্তে কোন্ শিল্পীকে দেখছি চোখের সামনে? তিনি রূপকথার লেখক না পুরাণকথার? বৈঠকি গল্পের লেখক না ভ্রমণ-কথা স্মৃতিকথার? তিনি পুঁথি-পালাগানের রচয়িতা না ছড়ার না গদ্যকবিতার? আবার তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখছি আগাগোড়া অতি সূক্ষ্ম চিকনের কাজ। এ হল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হল তিনি কাদের শিল্পী? শিশুদের, না সাধারণ মানুষের, না বিদগ্ধ সমাজের? তাঁর ভিতরকার মানুষটি বালক-স্বভাবের না লৌকিক প্রবৃত্তির না বাদশাহি মেজাজের?

আবার শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন রূপের জাদুকর অন্যদিকে তেমনি কথার—বিশেষ করে শব্দধনির। তাঁর ভাষায় কখনো ফোটে বাঁশির রেশ, কখনো তার-ঝঙ্কার, কখনো-বা তালবাদ্যের শব্দতরঙ্গ। তাঁর রূপকথার আসরে বাজছে সোনার বাঁশি সোনার বীণা; গঙ্গার বুকে ফেরি স্টিমারের কেবিন-এ বাজছে কখনো রবাব, কখনো গোপীযন্ত্র; কোণার্কের সূর্যমন্দিরের সামনে তম্বুরার সঙ্গে সঙ্গত করছে পাখোয়াজ; আবার ভারি মিষ্টি একটি বাঁশের বাঁশি ভেসে আসছে তাঁর স্মৃতিকথায় —জোড়াসাঁকোর পুরনো বাড়ির 'দক্ষিণের বারান্দা' থেকে। এদিকে 'রঙ-মহলে'র জলসাঘরে নর্তকীর নূপুরের তালে তালে বাজছে সারেঙ্গী-সেতার; যাত্রার আসরে বেহালা-হারমোনিয়ামের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তবলা মন্দিরা; কনসার্টে বাজছে ফ্লুট কর্নেট করতাল, আর ব্যাণ্ডবাদ্যে বিউগল্ ঢাক-ঢোল কাঁসি। অন্যদিকে, যেখানে কোনো তালবাদ্যেরই প্রয়োজন নেই—সামান্য হাততালিতেই চলে—সেখানেও ছড়া কাটবার সময়ে বাজছে কখনো ঢোল—তাকুড়-তাকুড়-তাকা, কখনো খঞ্জনি—নিগিরিটিং।

কিন্তু কেন? তিনি কি ভাষার সংগীতগুণ পরীক্ষা করতে চান? মোটেই না। আমরা আগেই বলেছি, বিচিত্র শব্দধ্বনির তির্যক ব্যঞ্জনায় রূপকে মূর্ত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। তাই মরুশয্যায় অর্ধনিমগ্ন কোণার্কমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন বলেন—

পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, তখন 'মৃদঙ্গ' আর 'মন্দ্র' এই দুটি পটহনাদ···

কম্পিত বাক্-ধ্বনির সাহায্যে তিনি স্পন্দিত ক'রে তোলেন বহু শতাব্দীর নৈঃশব্দ্য-পরিবেষ্টিত সূর্যমন্দিরের বিরাট্ প্রাণছন্দকে। কিন্তু শুধু মহৎ সৌন্দর্যের কথাই বলছি কেন? প্রকাশের আলোকে 'মহৎ' 'তুচ্ছ' সবই তো অপরূপ। হাজার বছরের বিশাল বনস্পতি আর সদ্য চোখ-মেলে-চাওয়া কচি তৃণাঙ্কুর—দুই-ই সৃষ্টির পরম বিস্ময়। 'নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে অরণ্যের পতঙ্গ অবধি' সবই বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশলীলা। শিল্পে তাই একদেশদর্শিতার স্থান নেই, ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির প্রশ্নও অবান্তর। শিল্পীকে হতে হয় সর্বানুভূঃ—সবকিছুর সঙ্গে সমপ্রাণ।

অবনীন্দ্রনাথের এই 'সমপ্রাণতা'-গুণটি বিস্ময়কর। একদিন বাণীলোকে যাঁর ধ্যানমূর্তিটি প্রত্যক্ষ করে এসেছি কোণার্কমন্দিরের ক্লাসিক সৌন্দর্যের শিখরচূড়ায়, অন্যদিন তাঁকেই দেখছি এক ভিড় কিম্ভূত চরিত্র নিয়ে উদ্ভট পালাগান রচনায় ব্যস্ত। কোথায় অমর ভারতশিল্পের ঐশ্বর্যময় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের জগৎ আর কোথায় চপল হাসি-ঠাট্টা-মুখর লৌকিক যাত্রা-গানের আসর! অথচ এখানেও তিনি সুনিপুণ ভাষাশিল্পী—রূপের পর রূপ সৃষ্টি ক'রে চলেছেন শব্দধ্বনির বিচিত্র ব্যঞ্জনায়। তবে এবারে তিনি একেবারে অন্য মানুষ। বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁর ভাষার ভোলটাও গিয়েছে পাল্‌টে। যাত্রার সূচনাতে শুরু হয়ে গিয়েছে কন্‌সার্ট। 'ব্যাণ্ড-মাস্টার' নটবর নন্দী আর 'বিউগ্‌ল-বাজিয়ে' নবীন নিয়োগী—দুজনেই মাত ক'রে দিয়েছে আসর। এদিকে ফ্লুট ধরেছে নরহরি নাগ, আর 'বেয়ালা, পিকলু…হারমোনিয়া'র সঙ্গে সংগতি রেখে বাজছে 'করনেট করতাল ঢোল-খোল'। বাজনার ঝোঁকটা শোনা যাচ্ছে মোটামুটি এইরকম—

| ১ ১ ঃ ১ | ১ . ১ ১ ১ |
| ব্যাণ্- ডো ঃ মাস্- টার্ | নন্- দী ঃ নট- বর্ |

| ১ ১ ১ ঃ | ১ ১ ১ ১ |
| নিউ- গী ঃ বিউ- গিল্ | ফু- উ ঃ ল- ট্ |

| ১ ১ ১ ১ |
| আর ছাগ্ লাগ্ ঃ নর- হরি |

—লম্বকর্ণ পালা পৃ ২

সুতরাং আসর একেবারে সরগরম। বাক্যের অর্থসংগতি আবার কী? শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা থেকেই তো দেখতে পাচ্ছি 'ক্রেসিন ব্যাঙে'র গোটা দলটাকেই। তবে ব্যাঙ বাদ্যের এক দলের সঙ্গে অন্য দলের নিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। 'ইংলিশ ব্যাঙে'র বাদ্যভাণ্ড আকারে বড়ো, তার বাজনাও উচ্চনাদী। সে বলে—

বিপদি ধৈর্যং
ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং কুরু ধৈর্যং কুরু

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৬৩

আর 'মাদ্রাজি ব্যাঙে'র বাদ্যভাণ্ড ছোটো; তার 'মৃতুবাদ্য' বলে—

চাং চাং মোচাং চাং মোচাং
ধিরিকিটি ধিরিকিটি ঝাং ঝাং

—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৫৩

এ দুটি ক্ষেত্রে অর্থসংস্কারমুক্ত শব্দের বাক্-ধ্বনি থেকেই মূর্ত হয়ে উঠেছে 'ইংলিশ ব্যাঙ' আর 'মাদ্রাজি ব্যাঙে'র পৃথক্ পৃথক্ চারিত্রলক্ষণ।

অবশ্যি 'অর্থসংস্কারমুক্ত' বলতে এখানে শব্দের বিশিষ্ট আভিধানিক অর্থমুক্তির কথাই বোঝাচ্ছি। এর থেকে মুক্ত না হলে শুভংকরের কাঠার আর্যা থেকে কী ক'রে বেরিয়ে আসত সেই কুরকুর-ক'রে-ঘাস-খাওয়া আশ্চর্য ছাগল-ছানাটি, যার কথা শুনে এসেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে—অবনীন্দ্রনাথের নিজের জবানিতে? এখনই তো চোখে ভাসছে আরো একটা ছবি: ফেরি-স্টীমারের কেবিন-এ রবাব বাজিয়ে পেশোয়ারি লোকটা গান গাইছে—

স্লমিওসী পমঙ্গল স্লমিওসী
পদম্কেনা পমঙ্গল স্লমিওসী-ঈ-ঈ—

আর 'দোশালা' গল্পের নায়ক অনুভব করছে—

'পমঙ্গল' 'পমঙ্গল' যেন মশার ঝাঁকের মতো কানের কাছে কেবলই ভনভন করছে আর মাঝে মাঝে 'স্লমিওসী' সেগুলোকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে।

—পথে বিপথে পৃ ৪৭

চমৎকার! 'পমঙ্গল'গুলো হয়ে গেল ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা আর 'স্লমিওসী' এক মজাদার মশা-তাড়ুয়া—ফুঁ দিয়ে-দিয়ে যে তাদের কেবলই উড়িয়ে দেয়! কিন্তু আমরা তো এখন এসব নূতন ক'রে আলোচনা করতে বসি নি, কাজেই থাক্ এ প্রসঙ্গ। ততক্ষণে আর-একবার দেখে নিই অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার রাজ্যটাকে।

২

লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, মানুষ থেকে শুরু করে ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, হুরী-পরী, ঠাকুর-দেবতা—কে নেই তাঁর সৃষ্টিলোকে? গোড়াতেই বলেছি, তাঁর পুতুলগুলো পর্যন্ত জীবন্ত—তারা হাসে, নাচে, কথা কয়, গান করে। তাঁর ছড়া কিংবা রূপকথার অনেকগুলো চরিত্র তো বাস্তবের ধার-ই ঘেঁষে না, বৈঠকি গল্পের কতকগুলো চরিত্রও তাই। তারা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা মানতে নারাজ। আর পুঁথি-পালাগানের চরিত্রগুলো উদ্ভট তো বটেই, তাছাড়া অদ্ভুত রকমে ছন্নছাড়া,—কতকগুলোকে মনে হয় 'উন্মাদ পাগল'। কী ক'রে এদের সৃষ্টি করলেন তিনি, আর কী করেই বা সামলাতে পারলেন, সে এক বিস্ময়। অথচ তিনি যখন পুরাণকথা, ইতিহাস-কথা লিখছেন, স্মৃতিকথা বলছেন, ভ্রমণ-কথা শোনাচ্ছেন কিংবা শিল্প নিয়ে আলোচনা করছেন তখন তাঁর রচনা সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের। এসব লেখায় প্রসঙ্গত যে-সব চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয় তারা একেবারেই বাস্তব। অবনীন্দ্র-সাহিত্যের এই দুই ভিন্ন কোটি এতই পরস্পর-বিরোধী যে এদের মধ্যে কোনো রকম সমন্বয়ের কথা ভাবতেও পারি নে। তাঁর শিল্পিস্বভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে এরকম বিপরীতধর্মী সৃষ্টি এমন অবলীলায় সম্ভব হয়েছে।

একটু আগেই বলেছি সৃষ্টির সবকিছুর সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য সমপ্রাণতার কথা। একে শুধু সংবেদনশীলতা (**Sympathy**) বললে যথেষ্ট হয় না। এ হচ্ছে শিল্পের প্রেরণাগত 'বস্তু-আদর্শে'র সঙ্গে শিল্পিসত্তার অন্তর্গূঢ় সহমর্মিতা (**Empathy**)। 'বস্তু-আদর্শ'গুলি যা-ই হোক—যতই পরস্পর-বিরোধী হোক—তাতে কিছুই যায় আসে না। বাস্তবেই হোক আর কল্পনাতেই হোক, যখন যে-বস্তুতে শিল্পীর চিত্ত তদ্‌গত বা তন্ময় হচ্ছে তখন তার সঙ্গেই তিনি স্থাপন করছেন এক অন্তরঙ্গ অভিন্নতা। ফলে তিনি তার প্রাণছন্দটিকে এমনভাবে মূর্ত করে তুলছেন যেন এটা তাঁর আত্মবোধেরই প্রকাশ। তাই বাস্তব-অবাস্তব, সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন সেখানে একেবারেই ওঠে না—এমনকি শিল্পীর ব্যক্তিবিবেকও এখানে প্রায় 'সাক্ষী চৈতন্য' মাত্র—'বস্তু-আদর্শে'র আত্মপ্রকাশই এর শেষ কথা।

হয় তো সেরা চিত্রশিল্পী ছিলেন ব'লেই তাঁর পক্ষে এটা এতখানি স্বাভাবিক হতে পেরেছে। ব্যাপক সংবেদনশীলতার গুণে মহৎ কবি আপন চিৎ-সত্তাকে

বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন—বিশ্বের অনেক-কিছুর মধ্যে নিজেকে অনুস্যূত করতে পারেন—কিন্তু 'বস্তু-আদর্শে'র সঙ্গে এতখানি একাত্মতাবোধ (**Sense of identity**) তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না। সার্থক চিত্র-শিল্পীকে কিন্তু অনেক সময়েই তা করতে হয়। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ধরা যাক, কোনো দরদী শিল্পী একটি কুকুরের ছবি আঁকতে বসেছেন। প্রাণীটাকে কী দৃষ্টিতে দেখছেন তিনি? তার বাইরের চেহারার আদল আর খুঁটিনাটি অবশ্যই চোখে পড়ছে তাঁর, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মনের দৃষ্টি চ'লে গিয়েছে আরো গভীরে; সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন ওই লোমে-ঢাকা জীবটির 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'কে—প্রত্যক্ষ করছেন তার প্রাণপুরুষকে, যে তার দুই চোখের জানালায় এসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে। মর্ত্যপৃথিবীর জীবনরহস্যের আলোকে এই নবপরিচয়ের মধ্যে দিয়ে শিল্পী অনুভব করছেন তার সঙ্গে আপন চৈতন্যময় সত্তার নিবিড় একাত্মতা। কিন্তু থাক্ এ প্রসঙ্গ। নিতান্ত সহজ উদাহরণ হিসেবেই একটি পরিচিত প্রাণীর রূপাদর্শের কথা বলা হল এখানে। বস্তুত প্রকাশলীলার ক্ষেত্রে প্রাণী অপ্রাণী সবকিছুরই নিগূঢ় প্রাণছন্দটি এমনি করে ধরা পড়ে শিল্পীর ধ্যানী-চিত্তের সহমর্মিতায়। কল্পিত রূপের বেলা আরো সহজ হয় এই একাত্মতা। কেননা বাস্তব রূপ বস্তু-আশ্রিত হওয়ায় তাকে দেখতে হয় চোখ দিয়ে, আর কল্পিত রূপ তো আগাগোড়াই কল্পনার সৃষ্টি—তা একান্তভাবে মনোরাজ্যের ব্যাপার। যা হোক, আমরা যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, এই একাত্মতা একবার স্থাপিত হলে অনেকখানি সহজ হয়ে আসে শিল্পীর কাজ, কারণ তখন আপন অনুভূতি প্রকাশের মতোই স্বচ্ছন্দ হয়ে আসে তাঁর শিল্প-প্রক্রিয়া,—মনে হয় যেন তাঁর চেতনায় মিশে গিয়ে 'বস্তু-আদর্শে'র রূপ নিজেই আত্মপ্রকাশ করছে তাঁর তুলির মুখে। প্রকাশের এই সহজ স্বচ্ছন্দ-ভাবটি আমরা সব সময় লক্ষ্য করি অবনীন্দ্রনাথের লেখায়। এমন-কি 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে কিংবা 'ঘরোয়া'য়—যেখানে তিনি মুখে শুনিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কাহিনী—সেখানেও চোখের সামনে কেবলই ফুটছে ছবি—ছবির পর ছবি—কথাগুলো যেন ছবির ফোয়ারা।

ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। বলছিলাম, সম্ভব-অসম্ভবে-জড়ানো বিচিত্রবহুল 'বস্তু-আদর্শে'র সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের চিত্তের এই নিরন্তর 'একাত্মতা' সত্যিই বিস্ময়কর। কেননা তাঁর কল্পনার জগৎটা যে একেবারে এলাহী ব্যাপার।

তার একটা বড়ো অংশ জুড়ে তো অদ্ভুত আর কিম্ভুতেরই রাজত্ব। এদিকে মানুষ ছাড়াও কত অগুনতি রকমারি পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্প-কাহিনীতে, ছড়ায়, পুঁথি-পালাগানে। এরা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের কিংবা ঈশপের গল্পের পশু-প্রাণীদের মতো একেবারেই নয়। এরা সব জ্যান্ত—চলছে, বলছে, উঠছে, পড়ছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। এদের কথাবার্তা আচার-আচরণে ফুটে উঠছে প্রতি মুহূর্তের প্রাণচাঞ্চল্য। এদের সঙ্গে অনবরত সহমর্মী হওয়া তো সহজ কথা নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষজীবনের 'সে', 'গল্প-সল্প' প্রভৃতি বইয়ে এবং কিছু-কিছু ছড়ায় ধ'রে রাখতে চেয়েছেন এদের কতকগুলোকে,—তাও অবনীন্দ্রনাথের মতো এমন আপন-ভোলা হয়ে নয়। তিনি নিজেও তা জানতেন। মনে পড়ছে তাঁর 'পুনশ্চ' বইয়ের 'ছেলেটা'র কথা। পরের ঘরে মানুষ দুরন্ত স্বভাবের ছেলেটার প্রতি কবির একটা অকৃত্রিম সমবেদনা জেগেছিল সত্যি, কিন্তু তা ততখানি সহমর্মিতায় পৌঁছয় নি, যেখানে পৌঁছলে তিনি হতে পারতেন তার মনের মতো কবি। শিশুপাঠে তাঁর কবিতার প্রতি তার অনীহার কথা শুনে তিনি দুঃখ করে বলছেন—

> সে ত্রুটি আমারই,
> থাক্‌ত ওর নিজের জগতের কবি,
> তাহলে গোবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
> ও ছাড়তে পারত না।
> কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
> আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।
>
> —'রবীন্দ্ররচনাবলী' : জন্ম-শতবার্ষিক সং : ৩/৩৩ পৃ

কিন্তু 'ছেলেটা'র 'নিজের জগতের' অন্তত একজন কবি উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছেই—তিনি অবনীন্দ্রনাথ। ওর মনের মতো ক'রে তিনিই বলতে পারতেন 'গোবরে পোকা'র গল্প, 'ব্যাঙের খাঁটি কথাটি' আর 'নেড়ি কুকুরের' কাহিনী। তবে শেষের গল্পটা তাঁর হাতে ট্রাজেডি হত কি না তা হলফ ক'রে বলতে পারি নে। কেননা তিনি নিজে যেমন ছিলেন আমুদে মানুষ, ছোটোদেরও তেমনি সব সময় রাখতে চাইতেন হাসিখুশিতে। তাই এমনও হতে পারত, হেড়ম্ব গণেশ এসে 'বুং' বলে একটা মন্ত্র পড়তেই জ্যান্ত হয়ে উঠত ওর সেই খোঁড়া কুকুরটা—'প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে' যার ঘটেছিল 'দেহান্তর'। আর এদিকে বিদয় ছুটে এসে

'হাঃ ফুঃ' বলে তিনবার ঝাড়-ফুঁক দিতেই জুড়ে যেত কুকুরের সেই ভাঙা 'চতুর্থ পা'খানা—যা বিকল হয়ে পড়েছিল তার নিজেরই 'অপকর্মের মুখে'। ফলে অবনীন্দ্রনাথ যা চাইতেন তাই ঘটে যেত অবিকল—'ছেলেটা'র চোখের জল শুকোবার আগেই মুখে ফুটে উঠত হাসির রেখা।

এরকম সামান্য দুয়েকটা গুবরে পোকা, ব্যাঙ কিংবা কুকুরকে সামলানো তো তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখে এসেছি তাঁর রাজ্যে এক কীট-পতঙ্গই তো রয়েছে কত! বোলতা, মৌমাছি, উইচিংড়ি, ফড়িং, মশা, মাছি, কাচপোকা, ঝিঁঝিপোকা—এদের সংখ্যাই তো অগুনতি; আবার হাঁস, পায়রা, মুরগি—এসব গৃহপালিত পাখি ছাড়াও কাক, কোকিল, পেঁচা, পাপিয়া, বসন্ত বাউরি, তালচড়াই, শালিখ, ছাতারে, ঘুঘু, সেথো, মাছরাঙা—কত যে রকমারি পাখি উড়ছে তাঁর সৃষ্টির আকাশে তাদের সবগুলোর নামও একসঙ্গে মনে আনতে পারি নে। এদিকে ব্যাঙ, ছুঁচো, ইঁদুর, ভোঁদড় থেকে শুরু করে বেড়াল, কুকুর গোরু-মোষ, ছাগল, ভেড়া, হুড়ুদুম্বা, নেকড়ে, বাঘ—সবাই নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর গল্প, ছড়া আর পুঁথি-পালাগানের বেওয়ারিশ মাঠে। মানুষের কথা নয় ছেড়েই দিলাম: দেশ-বিদেশের মানুষ—নানা ঢঙের ছেলে-বুড়ো-যুবক—সবাই মিলে কী যে কাণ্ড বাঁধিয়েছে তাঁর সাহিত্যে সে তো তাঁর পালাগান আর গল্প-কাহিনীগুলিতেই দেখতে পাচ্ছি। এ ছাড়াও রয়েছে যত সব ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, পরী আর দেব-দেবী। পাহাড়ের অদৃশ্য খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ যেমন আকাশ ছেয়ে যায় পঙ্গপালে, তাঁর জাদুকরের ঝোলা থেকে বেরিয়ে এসে এরাও তেমনি ছেয়ে আছে শুধু আকাশ নয়—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল। এ যেন আর-এক মহাকাব্যের জগৎ! বলতে-বলতেই মনে পড়ছে তাঁর 'এসপার ওসপার পালা'য় তুড়ি-জুড়ির মুখে বসানো আশ্চর্য একটি বাউল-ঢঙের গান—তাতে আছে একটি রহস্যময় পাখির কথা—

> ও মন দেখরে চেয়ে আজব তামাসা
> স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে এক পাখির বাসা।

'তামাসা'টি সত্যি 'আজব', আর পাখিটিও বিস্ময়কর। তার—

> এক এক ডিমে কত কারখানা
> ও তা গোনা যায় না
> কেউ জানে না কত হয় ছানা।

এবং এর চেয়েও বড়ো রহস্য হচ্ছে—

এক পাখিতে সবার আহার
জোগায় রে—
সবে সমান তার ভালোবাসা!

অবনীন্দ্রনাথের কল্পনাকে এই আশ্চর্য পাখির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করে। অবশ্যি পৃথিবীর সব সেরা শিল্পীর মধ্যেই রয়েছে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য-সৃষ্টির প্রতিভা। কিন্তু 'সবে সমান তার ভালোবাসা'—এ-কথা সকলের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়। এর জন্যে থাকা চাই 'বস্তু-আদর্শে'র প্রতি শুধু নিষ্ঠা আর একাগ্রতা নয়, তার সঙ্গে সহধর্মিতা, সমপ্রাণতা—একাত্মতা। এই অসামান্য ভালোবাসার শক্তিতে অবনীন্দ্রনাথ অপরাজেয়।

৩

কিন্তু আর নয়। এবার শুধু সম্পূর্ণ করে দিতে চাই আলোচনার বৃত্তপরিধিকে, অর্থাৎ বইয়ের সমাপ্তিকে মিলিয়ে দিতে চাই সূচনাবিন্দুতে। আগেই বলেছি, শিল্পবিচারে শেষ কথা ব'লে কিছু নেই। বৃত্তের একটা সুবিধে এই যে তার সমাপ্তি কোথাও দাঁড়ি টানতে পারে না।

গোড়াতেই বলেছিলাম, মূলত চিত্রশিল্পী হয়েও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রূপ-সৃষ্টির আবেগকে মুক্তি দিয়েছিলেন ভাষায়, বাণীলোকে এসেও তাই ছবির জাদুকর হয়েই দেখা দিয়েছেন তিনি। অন্য চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রে যা-ই হোক, তাঁর বেলা যে এটি সম্ভব হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি এবং এর কারণ সম্বন্ধে শুরুতে খানিকটা আলোচনাও করেছি। অবশ্যি এর আরো একটা কারণ সম্ভবত এই যে 'রঙ-রেখা'য় ধরা পড়ে যে 'রূপ' তা বস্তু-আশ্রিত হলেও আসলে 'বস্তু' নয়,—'ভাবরূপ'; তাকে ফুটিয়ে তোলবার অন্য একটি উপাদান হচ্ছে 'চিত্ররূপময় ভাষা',—যে-ভাষায় তাঁর সিদ্ধি ছিল জন্মগত।

বস্তুর রূপ যে বস্তু নয় এ-কথা বুঝতে খুব বেশি কল্পনার প্রয়োজন হয় না। ছবিতে নেমে আসে যে 'রূপ' সে তার আদর্শ-গত 'বস্তু-আধার' থেকে মুক্ত হয়েই আসে—তখন সে 'কায়ামুক্ত ছায়া'—ছবিতে ধরা পড়বার পর তার 'বস্তু-আধার' বিনষ্ট হয়ে গেলেও সে থেকে যায় অক্ষত। রূপের এই দেহমুক্তি-তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'চিররূপের বাণী'

কবিতায়। পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থায়ী। ভঙ্গুর দেহের সঙ্গে দেহাশ্রিত রূপও যায় হারিয়ে। রূপের প্রেমিক মানুষের মনে তাই যুগ যুগ ধ'রে সঞ্চিত হতে থাকে হারানো প্রিয় রূপের বিচ্ছেদবেদনা। এর প্রতিবিধানের জন্যে দেবতার কাছে সে জানায় আকুল প্রার্থনা। সে প্রার্থনায় একদিন সাড়া দিলেন বিশ্বের দেবতা, সান্ত্বনার সুরে নেমে এল তাঁর আকাশবাণী—

মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ থেকে যায় আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।

অমনি দেবতার আশীর্বাদে—

রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারিদিক থেকে রূপের প্রেমিক।

—রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্ম-শতবার্ষিক সং : ৩/৭৪ পৃ

সেদিন সত্যি উঠেছিল 'শঙ্খধ্বনি' যেদিন 'দেহহীন রূপকে' চিত্রশিল্পী প্রথম ধরেছিলেন রঙ-রেখার মায়াজালে। তারপর একে-একে ভ'রে উঠতে লাগল চিত্রশালার পর চিত্রশালা। আবার এদের সঙ্গে এসে জুটলেন আরো একদল 'রূপের প্রেমিক'। তাঁদের ভাষা রঙ-রেখা নয়, ইঙ্গিতময় শব্দপ্রতীক। বিদেহী রূপ-কে বন্দী করলেন তাঁরা বাগর্থের জাদুমন্ত্রে। 'চিত্রপট' হয়ে উঠল 'চিত্তপট' —খুলে গেল চিত্ররূপময় বাণীলীলার বিচিত্র জগৎ। আবার দৈবাৎ এলেন এমন কিছু-কিছু শিল্পী, জাদুর তুটি খেলাতেই যাঁরা সিদ্ধহস্ত। সেরা জাদুকর এঁরা। সংখ্যায় এঁরা খুবই কম—কোটির মধ্যে গুটি। অবনীন্দ্রনাথ এই দুর্লভ মায়াবীদের একজন।

অবশ্যি শেষ জীবনে প্রায় তিন হাজার ছবি এঁকে রবীন্দ্রনাথও প্রমাণ করে গিয়েছেন তিনিও ওই দলে। তবে লেখার কাটকুট আর আঁকিবুকি থেকে শুরু-করা তাঁর ছবিগুলি এতই ভিন্ন প্রকৃতির যে তাঁর সৃষ্টিলোকের এই যুগ্মধারা নিয়ে আলোচনা করতে হলে পৃথক বই লিখতে হয়,—স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে আমরা শুধু ভাবছি অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্বের কথা। একসঙ্গে তুটি শিল্পক্ষেত্রে রূপদক্ষের কী নিরঙ্কুশ অধিকার বিস্তার করেছেন তিনি। ছবির বেলা তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনায় যদি-বা কিছুটা পরিচয়

পাওয়া যায়, লেখার বেলা—বিশেষ ক'রে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে—তাও নয়। ফিরে-ফিরে কেবলই মনে পড়ছে বুড়ো আংলার কুঁকড়োর সেই ছোট্ট একটি কথা। পাখির আলোচনা প্রসঙ্গে আগেও উদ্ধৃত করেছি এটি। কিন্তু তা হলেও কথাটি পুরনো হবার নয়। ওই একটি কথায় তাঁর সম্বন্ধে সব কথাই বলা হয়ে গেছে। 'ওবিন ঠাকুর' সত্যি 'ছবি লেখে'। লিখ্-ধাতু বলতে 'আঁকা' 'লেখা' দুই-ই বোঝায়, তাঁর ক্ষেত্রে দুটি অর্থই সার্থক। উপসংহার একটা যদি টানতেই হয় তাহলে কুঁকড়োর এই মোক্ষম ঘোষণাটিই হোক আমাদের উপসংহার।

তাছাড়া কথার আর দরকার-ই বা কী? যা ঘটে গেল সে তো চোখেই দেখতে পেলাম। এ সুযোগ দৈবে মেলে কদাচিৎ। বস্তুত একই প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে রূপ আর বাণীর এমন সার্থক যুগলমিলন সকল দেশে সকল কালেই বিরল। এ যে কত বড়ো বিস্ময় তা যথার্থরূপে জানতেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা এ দুটি শিল্পে তিনি নিজেও করেছিলেন যুগ্মসাধনা। বলতে বলতেই মনে পড়ছে 'চিররূপের বাণী'র শেষ তিনটি পংক্তি, শিল্পের এই যুগ্মসিদ্ধির ক্ষেত্রে যা চিরস্মরণীয়—

> জয়ধ্বনি উঠল মর্ত্যলোকে।
> দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
> প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।
>
> —রবীন্দ্ররচনাবলী : জন্ম-শতবার্ষিক সং : ৩/৭৫ পৃ

আমাদের কণ্ঠও মিলিত হোক এই 'জয়ধ্বনি'তে।

প রি শি ষ্ট

প্রথম অধ্যায়ে বলেছি আমাদের ছন্দোবোধ উদ্রেকের মূলে রয়েছে পুনরাবর্তন এবং প্রত্যাশা। অবশ্য এই প্রত্যাশাও পুনরাবর্তন-সঞ্জাত। পদ্যের নিরূপিত মাত্রার পর্ববিন্যাসে এই পুনরাবর্তন যেমন স্বাভাবিক, গদ্যে তা নয়। গদ্য বাক্‌পর্ব-পরম্পরায় মাত্রাসমকত্ব স্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না, এমন-কি মাত্রার মোটামুটি ভারসাম্য রক্ষারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে এটা এত বেশি লক্ষ্য করা যায় যে একে তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলতে হয়। এরকম অনেকগুলি উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে প্রথম পর্যায়ে আরো কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া গেল। এগুলি মুখ্যত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

ক. একই ধ্বনির পুনরাবর্তন।

খ. অবিকল এক ধ্বনির না হলেও একই পর্যায়ের মুক্ত-রুদ্ধদলের পুনরাবর্তন।

গ. একই পর্যায়ক্রমে দলবিন্যাস না হলেও মোটামুটি একই ঝোঁকের বাক্‌পর্বের পুনরাবর্তন।

এ ছাড়া 'ক্ষীরের পুতুলে'র বাক্‌পর্বের গঠন ও বিন্যাস সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে সেই সূত্রে এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কিছু নূতন উদাহরণ উদ্ধৃত হল। এদের বিশিষ্ট প্রকৃতির ঝোঁকগুলি লক্ষণীয়।

সব শেষে বক্তব্য এই যে, পরিশিষ্টে সজ্জিত তালিকাগুলি নিতান্তই দৃষ্টান্তসূচক। এদের পূর্ণাঙ্গ মনে করবার কোনোই কারণ নেই।

পরিশিষ্ট ১

ক : একই ধ্বনির পুনরাবর্তন

দলসংখ্যা	বাক্‌পর্ব			গ্রন্থ পৃষ্ঠা
	ছি	ছি	ছি	কি-স ৮৯
	যাঃ	যাঃ		ভু-দে ৬৫

দলসংখ্যা		বাক্‌পর্ব		গ্রন্থ পৃষ্ঠা
১	রও	রও		ভূ-দে ১২
	আয়	আয়		” ৬৫
	কট	কট	কট	” ৬৫
	ঠিক	ঠিক		” ৭৫
	ছাড়্	ছাড়্		” ৫২
	চোর	চোর		ল-পা ১৬
২	আলো	আলো	আলো	আ-য় ৭
	কে রে	কে রে		” ২
	গেছি	গেছি		কি-স ৯১
	হনু	হনু		ভূ-দে ৫২
	কচাং	কচাং		কি-স ৯১
	তিড়িং	তিড়িং		” ৬৬
	খুলুক	খুলুক		আ ফু ৪৫
	ভুড়ুক	ভুড়ুক		রং-বে ৪৮
	গেলুম	গেলুম		ভূ-দে ৫২
	সামাল	সামাল		” ৮
	তিষ্ঠ	তিষ্ঠ		বং-বে ৪৬
	হাড্ডু	হাড্ডু		কি-স ১০৪
	যাঃ ফুঃ	যাঃ ফুঃ		বং-বে ৩৪
	খুব ঠিক	খুব ঠিক		আ-ফু ৩৪
	ঝিকমিক	ঝিকমিক		” ৭
৩	হয়েছে	হয়েছে		রং-বে ৯
	দে ধুলো	দে ধুলো	দে ধুলো	আ-ফু ৩১
	ক্যা হুয়া*	ক্যা হুয়া*		ভূ-দে ৮১
	ধুমাধুম	ধুমাধুম		আ-ফু ৩৪
	ভুলব না	ভুলব না		” ৪৩
	দেখতে চায়	দেখতে চায়		আ ফু ৬

দলসংখ্যা		বাক্‌পর্ব	গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
৩	মত্তগজ	মত্তগজ	মা-পুঁ	৩৮
	কী সুন্দর	কী সুন্দর	আ-ফু	৫১
	ঠিক সত্যি	ঠিক সত্যি	"	৫
	আটটায় ঘুঁট	আটটায় ঘুঁট	"	২৭
	লাগ লাগ ঘুঁট	লাগ লাগ ঘুঁট	"	৩১
৪	ও বাবাজি	ও বাবাজি	কি-স	৮৮
	গুরুমশাই	গুরুমশাই	ভূ-দে	৮২
	এ যে কাঁপায়	এ যে কাঁপায়	মা-পুঁ	৩৮
	চললে বাঁচি	চললে বাঁচি	ভূ-দে	৭
	ধুপ্পু ঠাহুঁ	ধুপ্পু ঠাহুঁ	রং-বে	৪৬
	কী দেখলেম রে	কী দেখলেম রে	আ-ফু	৫১
	যুদ্ধং দেহি	যুদ্ধং দেহি	রং-বে	৮৩
	মুশকিল আসান	মুশকিল আসান	"	১৩
	দেখবই দেখব	দেখবই দেখব	আ-ফু	৩
৫	কেবলি শব্দ	কেবলি শব্দ	আ-ক	২৬
	হা শকুন্তলা	হা শকুন্তলা	শকু	৪৮
	এ কি অলক্ষণ	এ কি অলক্ষণ	রা-কা	৭০

পরিশিষ্ট ১

থ : একই পর্যায়ের মুক্ত, রুদ্ধ অথবা মুক্ত-রুদ্ধ দলের পুনরাবর্তন

সংকেত : মুক্তদল '-' ; রুদ্ধদল '।'

তারকাচিহ্নিত দৃষ্টান্তে বাক্‌ছন্দের বিশেষ ঝোঁকে যুগ্মস্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট।

দল-সংকেত	বাক্‌পর্ব				গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
--	চিঁচিঁ		পিঁপিঁ		ভু-দে	২১
,,	না না		না, মা		রা-কা	২১
,,	এটা		ওটা	সেটা	আ-ক	৫২
-।	এ ঘর		ও ঘর	সে ঘর	,,	২৬
,,	এদিক		ওদিক	সেদিক	,,	৫২
,,	কী জল		কী ঝড়		জো-ধা	৫
।-	উল্টা		পাল্টা	ভেল্কি	রং-বে	৩৬
,,	চলছে	বলছে	উঠছে	বসছে	আ-ক	৩৩
,,	চক্র	বক্র	তক্র	নক্র	রং-বে	৩৬
,,	মেজ্‌দি		সেজ্‌দি		আ-ক	১৭
।	ভেদ নেই		ছেদ নেই		,,	৩৩
,,	খিটখিট		টিকটিক		ভু-দে	২১
,,	গুজগুজ		ফুসফুস		রং-বে	৬৪
,,	কাটলেট		চপলেট		ল-পা	১৩
,,	সাত রাত		সাত দিন		জো-ধা	৬
	বলে না		চলে না		বা-শি	৪৭
,,	এ ঘাটে		ও ঘাটে	সে ঘাটে	প-বি	৪৩
,,	কি ছেলে		কি মেয়ে*	কি দামী	আ-ক	৩১
·।-	কাসুন্দে	ঘাসুন্দে	ঝালুন্দে	মারুন্দে হারুন্দে	ভু-দে	২৮
·।।	হুতুমথুম		হুতুমহুম		আ-ফু	৩১
,,	নিঝুম রাত		দুপুর রাত		,,	৩১

দল-সংকেত		বাক্‌পর্ব		গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
-।।	অতুল ফুল	আলোর ফুল		আ-ফু	৭
,,	মড়াম্মড়	চড়াচ্চড়	ঘড়াঘ্‌ঘড়	চাঁ-পুঁ	৫৯
।--	ফুল কাটা	গালচেতে		আ-ফু	২০
----	নোনাপানি	কালাপানি		রং-বে	১৭
,,	ঝুঁটিকাটা	কাকাতুয়া		আ-ফু	৬৫
,,	মেজপিসি	সেজপিসি		কি-স	৮৯
---।	সুয়োরাণীর*	বড়ো আদর		ক্ষী-পু	৭
-।--	আবার আলো	আবার ধুলো		প-বি	১১৩
,,	এঘর জলে	ওঘর জলে		চাঁ-পুঁ	১০৬
,,	দুধের বাটি	জলের ঘটি		আ-ক	২৭
,,	রূপের ডালি	দুধের বাছা		শকু	৯
।- -	মন্‌সাতলা	চালতাতলা	শেওড়াতলা	ল-পা	৪৮
--।-	হাঁ-ও* দেন না	হুঁ-ও* দেন না		মা-পুঁ	৬৭
-।--	লাঙলটাকে	কোদালটাকে		আ-ফু	৪৬
,,	ঝাঁপিয়ে পড়া	গড়িয়ে চলা		প-বি	১২০
।---	কান্দাহারি	চম্পাবাড়ি		আ-ফু	৫৯
--।।	বাজি জেতবার	মজা দেখবার		আ-ফু	৬০
-।।।	দেখেও ফেললেম	চিনেও ফেললেম		আ-ক	২৬
-।।-	জগৎসুদ্ধ	সবার কান্না		আ-ফু	৪২
।-।-	কালকাসুন্দি	আমতাসুন্দি			
	ঝালকাসুন্দি	জামতাসুন্দি		ভূ-দে	২৮
।।।।	জিত যার হার তার	হার যার জিত তার		রং-বে	১৩৩
-----	বাঁশি বাজিয়ে*	আলো জ্বালিয়ে*	ঘোড়া ছুটিয়ে*	ক্ষী-পু	৬০
---।-	বাঁশি বাজাচ্ছে	নেচে বেড়াচ্ছে		,,	৭৩
-।---	রাণীর গরবে	স্বামীর সোহাগে		,,	২৫
----।	কমাতে পারেন	বাড়াতে পারেন		মা-পুঁ	৩০
।।-।-	গড় গড় গড়াচ্ছে	দুমদুম লাফাচ্ছে		আ ক	৫০

ছন্দ সংকেত	বাকপর্ব		গ্রন্থ	পৃষ্ঠা
।।।-।	চর চর ঘাস খেতাম	ঢক ঢক জল খেতাম	রং-বে	১০৭
--।--।	বাঘের মতো মুখ	গোরুর মতো ল্যাজ	,,	

পরিশিষ্ট ১

গ : মোটামুটি একই ঝোঁকের বাক্পর্বের পুনরাবর্তন

খালি হাত	অবুনাথ	ল-পা ৬২
চিৎপাত	কুপোকাৎ	রং-বে ৩০
দণ্ডবৎ	নাকে খৎ	মা-পুঁ ৩৭
জয় রাম	লঙ্কাধাম	চাঁ পুঁ ২
চন্দ্র নেই	তারা নেই	রা-কা ১০
বাতাস ডাকে	দরজা পড়ে	আ-ক ২৬
তক্তার নিচে	সিঁড়ির কোণে	,, ৫৬
ধড়টি খোকার	মাথাটি হাতির	শিল্প ৩৯
গণেশের ইঁদুর	কার্তিকের মউর	চাঁ-পুঁ ১০
কত কি চরিত্রের	কত কি ঢঙের	আ-ক ৩৩
কী সুন্দর রঙ	কী সুন্দর খেলা	রা-কা ৪৭
নীল আকাশের ছায়া	রাঙা মেঘের ছায়া	শকু ৫
একটি দিন আসেন	একবার বসেন	ক্ষী-পু ৭
দেবী না পদ্মিনী	পদ্মিনী না দেবী	রা-কা ৯১
বসন্তে কোকিল গাইত	বর্ষায় ময়ূর নাচত	শকু ৬
চাঁদ ওঠে সেদিকে	সূর্য ওঠে সেদিকে	আ-ক ৩০
ওই বুঝি ভালুক এল	ওই বুঝি বাঘে ধরলে	শকু ২২
শেয়াল হোয়া দিলে	বিড়ালে মেও ধরলে	চাঁ-পুঁ ১৪
শকুনি বলে শকুনি	শকুনির মামা শকুনি	রং-বে ২৯

কত কি মজা	আঠারো ভাজা	জিবে গজা	জো-ধা ৬
মানিকের পাখি	মুক্তোর ফল	পান্নার পাতা	শকু ৩৭
মানিকের দেশে	মানিকের ঘাট	মানিকের বাট	ক্ষী-পু ১৬
সোনার দেশে	সোনার ধুলো	সোনার বালি	,, ১৬

কত পাখি   কত বরা   কত বাঘ   কত ভালুক   শকু ১৭

ঘরের চাল   নতুন
চালের খড়   নতুন   ক্ষী-পু ৩৮-৩৯

দেবকন্যের হাতে   বোনা
নাগকন্যের হাতে   গাঁথা   ,, ২০

আকাশের মতো   নীল
বাতাসের মতো   ফুরফুরে   ক্ষী-পু ৯

যা কিছু কুড়োবার   কুড়িয়ে
যা কিছু গুঁড়োবার   গুঁড়িয়ে   প-বি ১৩৮

হাতিশালে কত   হাতি ছিল
ঘোড়াশালে কত   ঘোড়া ছিল   শকু ১৩

তোমার এই   কাঁটার বেড়া
তোমার এই   সবুজ ঘাস   আ-ফু ৭৫

স্বর্গে মর্ত্যে   আলো দেবার
অন্ধকারকে   দূর করবার   ,, ৪৯

মেঝেয়   নতুন কাঁথা
আলনায়   নতুন শাড়ি   ক্ষী-পু ৩৯

মিছে কথা	কেন রটালি		
এ জঞ্জাল	কেন ঘটালি		ক্ষী-পু ৩৫
সাত মালকের	সাত সাজি ফুল		
সাত সিন্দুক ভরা	সাত রাজার ধন		” ৭
এক মাস গেল	দু'মাস গেল		
দু'মাস গিয়ে	তিনমাস গেল		” ৩৭
মুরগির ঝুড়ি	আধপোড়া বিড়ি		
দড়ি-বাঁধা বাক্স	কড়ি-বাঁধা হুঁকা		প-বি ১৩৪
উদ্‌ভট্টির চরটায়	রোদ আর বৃষ্টি		
ঝিল্লি ফুকরায়	এ কি অনাসৃষ্টি		রং-বে ৫৭
প্রিয়ম্বদা	কেশর-ফুলের	হার নিলে	
অনসূয়া	গন্ধ-ফুলের	তেল নিলে	শকু ৩৩
ঘরের দেয়াল	মানিক		
ঘাটের শান	মানিক		
পথের কাঁকর	মানিক		ক্ষী-পু ১৩
হীরের বালা	হাতে পরব		
মোতির মালা	গলায় দেব		
মানিকের সিঁথি	মাথায় বাঁধব		শকু ১০
রূপোলি রঙের	সরল পুঁটি		
চাঁদের মতো	পায়রা চাঁদা		
সাপের মতো	বাণ মাছ		” ৪৫

অরুণ আছেন	বরুণ আছেন	
বিষ্ণু আছেন	শিব আছেন	
পবন আছেন	আগন আছেন	চাঁ-পুঁ ৭০

টাকা চাও	টাকা নাও	
ঘর-বাড়ি চাও	তাই নাও	
গায়ের গহনা চাও	তাও নাও	শকু ৪১

হা-ডু-ডু-ডু	দুই হাত তিন শিং	
হা-ডু ডু-ডু	নাচে তোতারাম	
হা-ডু-ডু-ডু	তা-ধিন ধিন	বং-বে ৩৮

এক সুপুরি	টুপ্‌	
দুই সুপুরি	টাপ্‌	
তিন সুপুরি	টিপ্‌ টাপ্‌ টুপ্‌	,, ১১৩

ছোটো বাসার	ছোটো পাখি	
সন্ধ্যা হলে	তোমায় ডাকি	
দিনের শেষে	তোমায় ডাকি	
বন্ধু এসো	তোমায় ডাকি	ক্ষা-পু ৭৫

সাত মহল	বাড়ি আছে	
সাত শো	দাসী আছে	
সাত সিন্দুক	গহনা আছে	
সাত থানা	মালঞ্চ আছে	ক্ষী-পু ২৫

অঙ্গের বরণ	কাঁচা সোনা	
জোড়া ভুরু	বাঁকা ধনু	
দুটি চোখ	টানা টানা	
দুটি ঠোঁট	হাসি-হাসি	,, ৫৩

ভালুক ছিল   মন্ত্রী
সিংহ ছিল   সেনাপতি
বাঘ ছিল   চৌকিদার
শেয়াল ছিল   কোটাল   শকু   ৫২

পুব-পশ্চিমে   মেঘ উঠল
আকাশ ভেঙে   বৃষ্টি এল
রাজ্য জুড়ে   ঘুম এল···
আমার কোলে   বুকের কাছে   ঘুম যা   ক্ষী-পু   ২৯

একখানি   ঘর দিয়েছেন   ভাঙা-চোরা
এক   দাসী দিয়েছেন   বোবা কালা
পরতে দিয়েছেন   জীর্ণ শাড়ী
শুতে দিয়েছেন   ছেঁড়া কাঁথা   ”   ৭

কারো পায়ে   লাল জুতুয়া
কারো মাথায়   রাঙা টুপি
কোনো ছেলে   রোগা-রোগা
কোনো ছেলে   মোটাসোটা
কেউ   দস্যি
কেউ   লক্ষ্মী   ,,   ৭৩

রক্তের মতো রাঙা   আট আটগাছা
মানিকের   চুড়ি পাই তো   পরি
আগুনের বরণ   নিরেট সোনার
দশগাছা   চুড়ি পাই তো   পরি   ক্ষী-পু   ৮

না পালকি   না নালকি
না গাড়ি   না ঘোড়া
চলেছি তো   চলেইছি
যেন কি   তো কি

না সজীব	না নির্জীব		ল-পা	৫৭
বাদশাই	আমলের	টাট্টু		
এর দাম এক	দিল্লিকা	লাড্ডু	”	৭০
টাকা-কড়ি চাও	না	ঘর-বাড়ি চাও	শকু	৩৮
একদিকে কারিগর	আর	একদিকে বাজিকর	রং-বে	৭৯
আপনার কেউ নয়	অথচ	আমারও কেউ নয়	প-বি	৯৭
মল জলতে লাগল	যেন	আগুনের ফিনকি		
বাজতে লাগল	যেন	বীণার ঝংকার—		
		মন্দিরার রিণি-রিণি	ক্ষী-পু	১৩

পরিশিষ্ট ২

ক্ষীরের পুতুলের কয়েকটি বিশিষ্ট ধরনের
বাক্‌পর্ব-বিন্যাস

তারকা-চিহ্নিত দৃষ্টান্তে বাক্‌ছন্দের ঝোঁকে যুগ্মস্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট।

দলসংখ্যা	বাক্‌পর্ব		পৃষ্ঠা
৪।২	কোন্ রাজকন্যের	শাড়ি	১৯
৪।৩	মুক্তোর দেশের	মুক্তোর হার	১৯
৫।২	ছাই সাধে আমার	কাজ নেই	১২

দলসংখ্যা	বাক্পর্ব		পৃষ্ঠা
৫।৩	ঘুমন্ত সাপকে	বশ ক'রে	৪৫
,,	সোনার ভৃঙ্গারে	মুখ ধুয়ে*	২৮
,,	বানরের ভরসায়	বুক বেঁধে	৫৯
,,	রাজপুত্রের আশায়	ছাই দিয়ে*	২৫
,,	রাজসিংহাসনের	একপাশে	২০
,,	কার বাসি মুক্তোর	বাসি হার	১৯
,,	জাল মুড়ি দিয়ে*	ঘুম দিচ্ছে	৭৫
৫।৪	ফুলের মালঞ্চে	সুখে আছে	২৫
,,	ক্ষীরের পুতুলটি	খেয়ে* আসি	৬২
,,	ক্ষীরের পুতুলের	বিয়ে* দিতে	৬০
,,	দেব্‌তার মন্দিরে	কত বলি	২৬
,,	নীলকান্তমণির	পাতা খেয়ে*	২০
,,	এক-খী রেশমে	সাত-খী সুতো	১৬
,,	বানরের কথায়	রাজা অবাক	২০
,,	কত রাজকন্মার	সন্ধান এল	৫৩
,,	শুক্‌শারীর পায়ে*	সোনার নূপুর	১০
,,	শিবঠাকুর এসে	নৌকো বাঁধলেন	৭৫
,,	শিবের মন্দিরে	পূজা করেন	১৪
,,	নাইতে পেলুম না	রাঁধব কখন	৩৮
,,	বিঘ্নহরণকে	ডাকতে লাগলেন	৬০
,,	সোনার পাখির গান	শুনতে শুনতে	১২
,,	আকাশের সঙ্গে	রঙ মিলিয়ে*	৩৪
,,	পোড়ামুখ একটা	বাঁদর এলো	১১
,,	শ্বেতহস্তী চড়ে	চলে গেলেন	৩৪
,,	অগাধ সাগরের	নীল জল কেটে	১১
৫।৫	রাজচক্রবর্তী	ছেলে হয়েছে*	৫০
,,	রাজসিংহাসনে	রাজা হয়েছে*	৩৪

দলসংখ্যা	বাক্‌পর্ব		পৃষ্ঠা
৫।৫	মোটা চালের ভাত	মুখে রোচে না	৩৭
”	দুয়ারে* শুনলেন	দাসীরা ডাকছে	৮০
”	তাঁর কথা একবার	মনে পড়ে না	১২
৫।৬	সাত রাজার ধন	মানিকের গহনা	৭
”	সাত মহল বাড়ির	সাত তলার উপরে	১৫
”	ষষ্ঠীঠাকরুণের	পূজো দিতে এল	৬১

পূর্ববর্তী তালিকার বিশিষ্ট দলবিন্যাসযুক্ত
কয়েকটি বাক্‌পর্ব

সংকেত : মুক্তদল ‘-’ ; রুদ্ধদল ‘।’

দলসংখ্যা	দলবিন্যাস	বাক্‌পর্ব
৩	। - -	মুখ ধুয়ে* ; বশ করে ; একপাশে ; বুক বেঁধে
৪	- - - -	সুখে আছে ; খেয়ে* আসি ; পাতা খেয়ে* ; বিয়ে* দিতে
	- - - ।	চলে গেলেন ; পূজা করেন
	। - - -	সাত-থী সুতো ; রঙ মিলিয়ে*
	। । - -	সন্ধান এল ; নীল জল কেটে
	। - । ।	সাত রাজার ধন ; নৌকো বাঁধলেন ; ডাকতে লাগলেন
৫	- - - - -	রাজা হয়েছে* ; ছেলে হয়েছে* ; মুখে রোচে না ; মনে পড়ে না
	। । - - -	রাজসিংহাসনে ; শ্বেতহস্তী চড়ে
	। - - । ।	তাঁর কথা একবার ; কার বাসি মুক্তোর

দলসংখ্যা	দলবিন্যাস	বাক্‌পর্ব
৫	।-।-।	সাত মহল বাড়ির ; ষষ্ঠিঠাকরুণের
	-।।--	সোনার ভৃঙ্গারে ; শিবের মন্দিরে
	-।-।-	ফুলের মালঞ্চে ; ঘুমন্ত সাপকে; ক্ষীরের পুতুলটি
	।।--।	নীলকান্তমণির ; রাজসিংহাসনের
	।----	এক-থী রেশমে ; জাল মুড়ি দিয়ে*
	--।।।	কত রাজকন্যার ; বানরের ভরসায়
	।-।--	শুক-শারীর পায়ে* ; শিবঠাকুর এসে
	।--।-	নাইতে পেলুম না : বিঘ্নহরণকে
	--।।-	আকাশের সঙ্গে ; পোড়ামুখ একটা
	-।--।	অগাধ সাগরের ; ক্ষীরের পুতুলের
	---।।	মোটা চালের ভাত ; দুয়ারে* শুনলেন